আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

অধ্যক্ষ ডঃ শুভংকর চক্রবর্ত্তী

১৯৮৭ ৮৮ সালের কলেজ পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হলো। ছাত্র সংসদের উদ্যোগ, তৎপরতা এবং অধ্যাপকদের সক্রিয় সহযোগিতা পত্রিকা প্রকাশের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। পত্রিকা প্রকাশনে বিগত পাঁচটি বছরের ধারাবাহিকতা এবছরও অব্যাহত রয়েছে। এই কৃতিত্বের সিংহভাগ ছাত্র সংসদেরই প্রাপ্য।

অন্যান্য বারের মতো এবছরেও বেশ কিছু লেখা ছাত্র ছাত্রীদের সৃজন ক্ষমতার প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। আর্থিক অপ্রতুলতা এবং সময়ের স্বল্পতা সত্বেও এবছরের পত্রিকাটির অঙ্গজুড়ে রয়েছে সাফল্যের সজ্জা। অন্যান্য বছরের সংখ্যাগুলির মতো বর্তমান সংখ্যাটিও সমাদৃত হবে—এই গভীর বিশ্বাস রাখি।

আশুতোষ কলেজ, ১৯৮৮

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ—১৯৮৭-৮৮

প্রকাশক
অধ্যক্ষ ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী
মুদ্রক
প্রিন্টেক্সট—২৯ডি, হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-২৬
প্রচ্ছদ
যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি ?
আমাদের চোখে জ্বলে আগুনের দৃষ্টি,
আমরা জবাব দিই সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি।
যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ কি শান্তি ?
আমাদের বেছে নিতে হয় না কো ভ্রান্তি,
আমরা জবাব দিই শান্তি শান্তি শান্তি।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
সিক্করীণা

সম্পাদন সহযোগী
অরিন্দম রায় চৌধুরী
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়
দিলীপ সামুই
রাত্রি মুখোপাধ্যায়
চিত্রক মজুমদার
অলোক চৌধুরী
সুমন ঘোষ
প্রবাল সেনগুপ্ত
রাজীব বিশ্বাস
অরুণেষ দত্ত
রাজীব হরিহরণ
নন্দিনী ঘোষ
শুভ্রাংশু শূর রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
অধ্যাপক শ্রীঅমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক শ্রীঅমল কুমার চক্রবর্তী
অধ্যাপক শ্রীপ্রণব বসু
অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্র নাথ দত্ত
শ্রীপল্টু রায় চৌধুরী
শ্রীসর্বজিৎ ঘটক
শ্রীসত্যেন রায়
প্রিন্টেক্সট, সৌরভ প্রিন্টার্স ও প্রিন্টল্যাণ্ড-এর
কর্মীবৃন্দ।

"মৃত্যুর বিষ নিশ্বাসের
আঘাতে—নিহত সাথী আমার
আমরা যারা আজো আছি
মাটি কামড়ে,
তোমাদের জন্য জড়ো করেছি
একরাশ ভালবাসা"

মন্মথ রায়	ডাঃ বিজয় বসু
প্রেমেন্দ্র মিত্র	রাজেন তরফদার
সমরেশ বসু	শ্যামল মিত্র
মনোজ বসু	অধীর চক্রবর্ত্তী
হেমাঙ্গ বিশ্বাস	বিজয় মার্চেন্ট
কিশোর কুমার	ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য্য
রাজকাপুর	আবদুল গফর খান
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	আবু জিহাদ
সন্তোষ দত্ত	ইমারুরী
কমঃ লীলা সুন্দারাইয়া	কমঃ উস্তিনভ
কমঃ গুরনাম সিং উপ্পল	কমঃ মলোটভ
কমঃ অভিরাম দেববর্মা	কমঃ আলফানসো লিবানোগ্রিক
কমঃ নিরঞ্জ রাই	কমঃ চিং লিং
কমঃ নীরণ প্রধান	কমঃ লে তুয়ান
সৈয়দ মোদী	কমঃ চিন সি
রথীন দেব	ডাঃ মুরারী মুখার্জী

★ বার্মায় শাসকদলের নির্লজ্জ আক্রমণে যাঁরা নিহত হয়েছেন।

★ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন।

★ বিহার ও নেপালের অভূতপূর্ব ভূমিকম্পে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন।

★ উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ—

পত্রিকা সম্পাদক
বিশ্বরূপ ধর চৌধুরী

সহঃ সম্পাদক
কৌশিক চট্টোপাধ্যায়
সোমনাথ ঘোষ

প্রিয় সাথী,

একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে, বেয়াল্লিশতম স্বাধীনতার প্যারেড এই তো সবে শেষ হলো। আমরা উন্নতিকামী—তাই কালাহান্ডির জীবন্ত কংকালগুলো পঁচিশ টাকায় বিকিয়ে দিচ্ছে নিজের শিশুপুত্রকে। আমরা নিরাপদ—তাই আমাদের প্রহরীরা উজানের ময়দানে ছড়িয়ে দিচ্ছে নৃশংসতার বিষ নিঃশ্বাস, আমরা ঐক্যবদ্ধ—তাই পাঞ্জাবের দৈনিক হত আহতের সংখ্যায় আমরা ক্লান্ত। আমরা হতাশ—বাবরী মসজিদের সাম্প্রদায়িক রক্তস্রোতে, হিন্দু মুসলমানে ভাগ করে দেবার নির্লজ্জ অপপ্রয়াসে, বিহারের হরিজন পল্লীতে অহরহ মৃত্যুবার্তায়। আমরা বিস্মিত—একদিকে 'বেকারী হঠাও' অন্যদিকে পার্কের পাশের বেঞ্চিতে পাড়ার দোকানে বা পাড়ার মোড়ের রকে শিক্ষিত কর্মময় যুবকের ক্রমবর্দ্ধমান ভিড়ে। একদিকে ভূপালের মানুষ যখন জন্ম দিচ্ছে বিকলাঙ্গ নতুন প্রজন্মের আরেকদিকে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় করে চলেছে আন্দামান আর সারিস্কার পিকনিক—আমরা ক্ষুব্ধ। আর এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আশুতোষ কলেজে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ আর স্মৃতিকথার খোঁজে। একতলার নোটিশবোর্ডে ক্যান্টিনের দেওয়ালে আর ক্লাশে ক্লাশে তাই পাঠিয়ে দিলাম বার্তা। কে জানত—এই কলেজের ইট কাঠ পাথরে ছিল এত সাহিত্যস্রোত। কে জানত যে সামনে বেকারত্ব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি সত্বেও চলছে সৃষ্টি সুখের উল্লাস। তাই তো কলেজের ওয়াল ম্যাগাজিনটা আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু কলেজের পর কিছু নিশাচর নষ্ট করে দিল ম্যাগাজিন বোর্ডটা। চেষ্টা করব সেই আগাছাগুলোকে উপড়ে দিয়ে নতুন করে দেওয়াল সাহিত্য শুরু করার। এরই মধ্যে প্রেরণা পেলাম আবার। গত বছরের ম্যাগাজিনটা ষ্টুডেন্ট হেলথ হোমের প্রতিযোগিতায় পত্রিকা বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা নিল ছিনিয়ে। খুশী হব ভীষণ, যদি এই ম্যাগাজিনের কোন গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ সারাদিনের ব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে আপনাকে প্রকৃত সাহিত্যের ঠিকানা যোগায়।

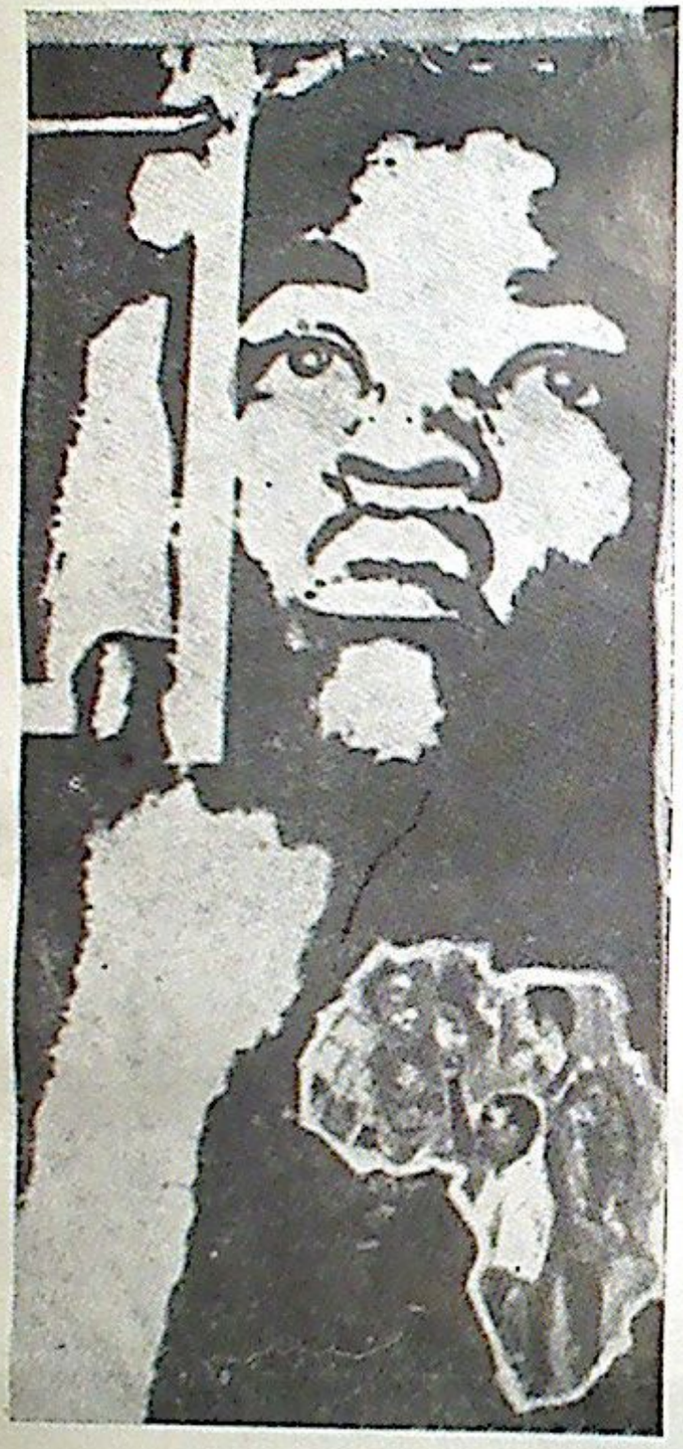

নেলসন ম্যাণ্ডেলার

মুক্তি চাই—

"এ ঝড় উঠেছে আজ আফ্রিকার প্রতি ঘরে ঘরে
এ ঝড় লিখবেই জানি রক্তের অক্ষরে
মুক্তির নির্ভীক সেনা নেলসনের জয়ের খবর
শয়তানের জয়ধ্বজা কি করে এড়াবে এই ঝড় ?
মৃত্যু নেই ম্যাণ্ডেলার
জয় হোক ম্যাণ্ডেলার
ম্যাণ্ডেলার নামের তারা অন্ধকারে জ্বলে
ম্যাণ্ডেলা আমারো ভাই
ম্যাণ্ডেলা আমারো সাথী
ম্যাণ্ডেলা আমার প্রাণে, রক্তে কথা বলে।"

বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান :

কলেজের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ছাত্রদের উৎসাহ ছিলো লক্ষনীয়।

কলেজ বাড়ির বাইরে একদিন—স্যারেদের জমাট আড্ডা।

প্রথম আন্তঃ কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা—সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক নতুন যাত্রা।

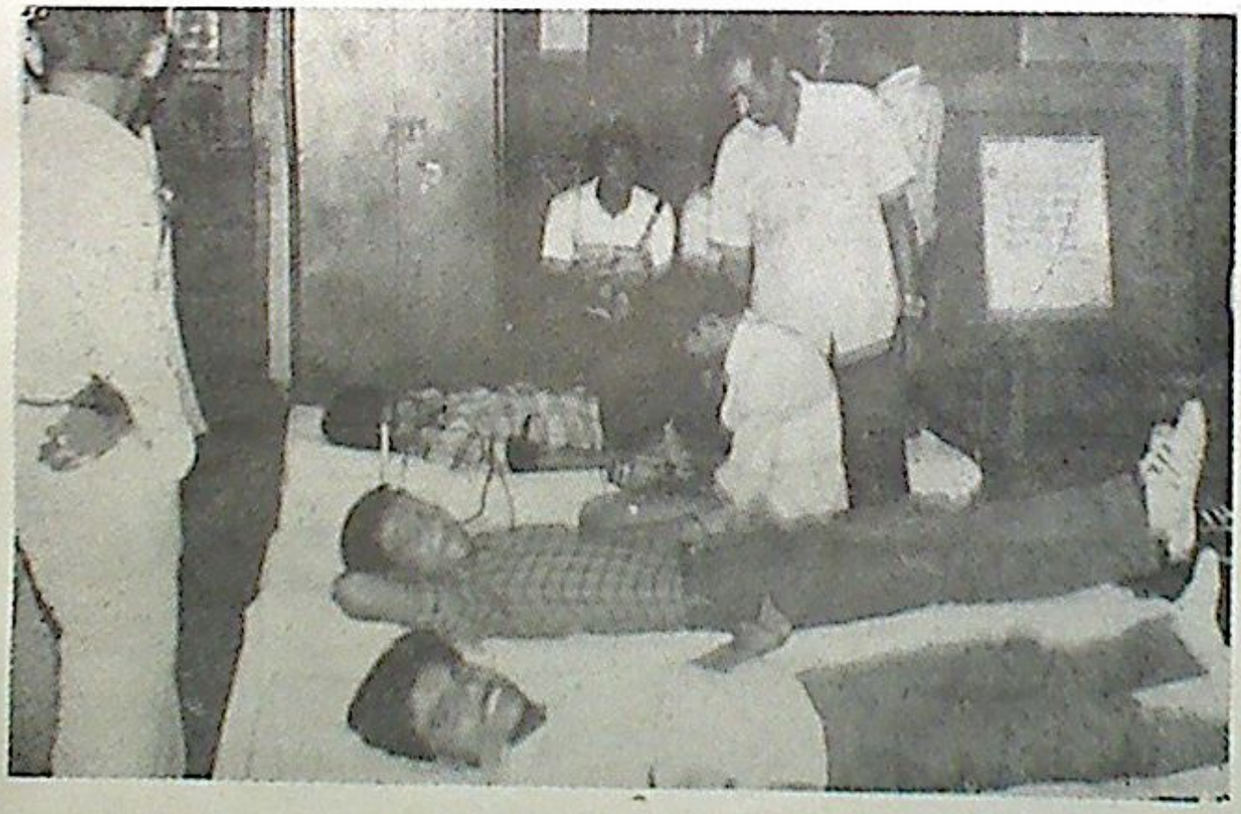

আমাদের রক্তারোদে ঝক ঝক করে উঠুক মুঠো মুঠো প্রাণ।
ছাত্র সংসদ আয়োজিত রক্তদান শিবির।

ফুটবল আমরা চ্যাম্পিয়ন—
অনিমা হোড় স্মৃতি চ্যালেঞ্জ
কাপ

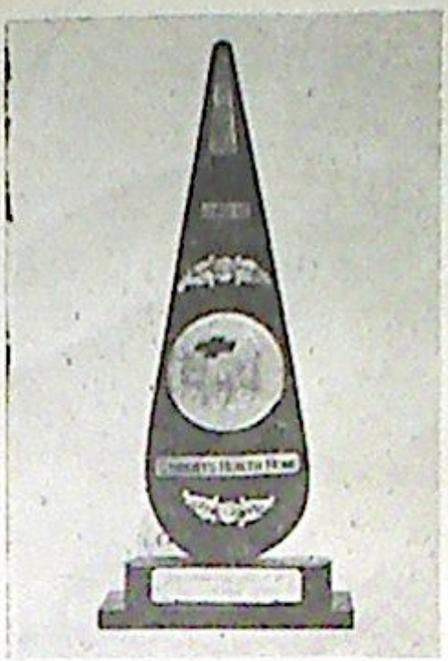

ষ্টুডেন্ট হেলথ হোমের
প্রতিযোগিতা—
আমাদের ম্যাগাজিনই শ্রেষ্ঠ

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের
টেবিল টেনিস—
আবার আমরাজিতলাম

কলেজের নতুন বাড়ি—আমাদের ৮২ সালের শ্লোগান, সবার স্বপ্ন— আজ বাস্তব।

সূচী

স্মৃতিকথা। যাবার বেলায় পিছু ডাকে ॥ অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। ১১

কবিতা। সহজ পাঠ ॥ অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী ১০

যীশুর মুকুট ॥ অনিরুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদায়ী বর্ষ, বিজ্ঞান। ১৭

চিরসখা ॥ শুচিস্মিতা ভট্টাচার্য, দেশবন্ধু গার্লস কলেজ। ১৭

অনামিত্র এদেশের এক পাভেলের নাম ॥ সুশান রায়, তৃতীয় বর্ষ, কলা। ১৮

আদিম কথা ॥ রঞ্জনা ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় বর্ষ, কলা। ১৯

শিষ্টাচার ॥ রাজীব চক্রবর্তী, তৃতীয় বর্ষ, কলা। ১৯

শিকল ছেড়ার দিন এসেছে আজ ॥ অনিন্দ্য বড়ুয়া, প্রথম বর্ষ কলা। ২০

সেই অচেনা অনুভূতির রাজ্যে ॥ অধ্যাপক দেবদাস রায়। ২১

নতুন স্বপ্ন ॥ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ২১

ডায়ালগ ॥ অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। ৪৫

এখানে থেকে যাও কিছু দিন ॥ অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ৪৫

আজও প্রমিথিউস ॥ দীপশিখা রায়, দ্বিতীয় বর্ষ, কলা। ৪৬

ওরা আসছে ॥ কল্লোল রায়, দ্বাদশ শ্রেণী কলা। ৪৬

গল্প বিষফুল ॥ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ২২

স্বপ্ন-বাস্তব জিজ্ঞাসা? ॥ প্রিয়জিৎ ব্যানার্জী, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান। ২৬

অনন্ত যাত্রা ॥ উদয়ন বন্দোপাধ্যায়, তৃতীয় বর্ষ, কলা। ৩০

মা ও মাটি ॥ আশিষ কুমার চন্দ্র, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান। ৩৩

অপরাজেয় ॥ প্রয়াস সরকার, একাদশ শ্রেণী, কলা। ৩৯

প্রবন্ধ চিরতরুণ হিমালয় ॥ তপন পোদ্দার, শিক্ষাকর্মী। ৪৭

সোভিয়েত দেশে নবীকরণের বিপ্লব ॥ অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান। ৫২

মানুষ ॥ সুধীর ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় বর্ষ, কলা। ৫৮

সংসদ বার্তা। সংসদ প্রতিনিধিদের কিছু কথা। ১১

ENGLISH SECTIONN 1—4

Essays Genius is one percent inspiration and ninty-nine percent perspiration—Ranjan Ghosh, 1st year, Science

Patriotism is the 1st refuge of the scoundrels—Souvik Guha Roy, XI, Science

Poem Fate—Jatin Talwar, 2nd year, Science

প্রচ্ছদ—সৌমেন রায় সিংহরায়।

ছবিগুলো তুলেছে আমাদেরই বন্ধু অভীক, উমেশ, তপনদা আর শম্ভুদা।

সহজ পাঠ

অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্ত্তী

আমরা বেশী বুঝি না, যা বুঝি
ভাতের সঙ্গে নুন না হলে চলে না

সেই আমাদের সুবোধ খিতুগোপাল করে কতই না বলো তোমরা
আর, আড়চোখে নজর রাখো কোনদিকে কতটা চলছি

মিথ্যে নয়, চল একটা আসে বটে, সেটা ঘুমে
কিন্তু যতক্ষণ জেগে থাকি, দেখি

তোমাদের কলহ আর গর্জনের স্তূপ থেকে
আমাদের সবার এক শিশু বেরিয়ে এসে বলে

কথা থাক, এবার বল তো সেই একটা দেশ আমাদের কিভাবে দেবে
যেখানে প্রতিদিন খাদ্যের জন্যে আর চিৎকার করতে হবে না।

যাবার বেলায় পিছু ডাকে

ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালে কাশী থেকে কলকাতায় চলে এলাম। ওখানেই কেটেছিল আমার কৈশোর। বাঙ্গালী টোলা স্কুলে পড়তুম। তখন আকাশ বাতাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ। একটা গান তখন খুব চালু হয়েছিল। যশোদা দুলাল মণ্ডলের রেকর্ড করা গান—"সারে গা মা পা ধা নি, বোম ফেলেছে জাপানী, বোমের মধ্যে কেউটে সাপ, বৃটিশ বলে বাপ রে বাপ"– "বোম পড়ে দ্রুম্ দ্রাম্ বৃটিশ বলে গ্রাম্ গ্রাম্—লেফ্ রাইট এক দুই তিন চার, বৃটিশ বলে মার মার।" বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে ছিল বাংলার বাইরেও। ওদিকে বাঙ্গালীর মনে রোমান্সের সুর কি থেমেছে! হেমন্ত মুখুজ্জের রেকর্ড বেরিয়েছে—প্রথম রেকর্ড—সেদিন নিশীথে বরিষণ শেষে চাঁদ উঠেছিল বনে"—'পরদেশী কোথা যাও, থামো গো হেথায়, পলাশ বনের পাশে। কি আশ্চর্য সেই সব দিন। তারপর সুভাষ বোসের ভারত ত্যাগ, একটা দারুণ রহস্য। সিঙ্গাপুরের পতন হল। প্রিন্স অব ওয়েলস্ আর রিপালস্ দুটো বৃটিশ জঙ্গী জাহাজের বয়লারের ভেতর জাপানী সেনা পিঠে বোমা বেঁধে সেঁধিয়ে গিয়ে ছাতু করে দিল। সিঙ্গাপুরের জাপানী নাম হল 'সোনান'। সেই যুদ্ধেরও হল অবসান। কলকাতায় হাতিবাগান আর খিদিরপুর ডকে বোমা পড়ল।

ফিরে এসে দেখলাম হাওড়া ব্রিজের মাথায় একটা বিশাল বেলুন উড়ছে। চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল। "ওয়ার ইজ ওভার"। আকাশের গায়ে জেট বিমানের গ্যাস দিয়ে লেখা হল—'ওয়ার ইজ ওভার'। আর তার কিছু দিন বাদেই কলকাতার রক্তাক্ত আবহাওয়ায় বেঁধে গেল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। জিন্না-সুরাবর্দির ডাইরেক্ট এ্যাকশন। কালীঘাটে শিখগুরুদ্বারের কাছে প্রথম মার্ডার হল। এক দিকে আল্লা হো আকবর, আর এক দিকে 'বন্দে মাতরম্'। মুঙ্গি বাটা বজ বজ পার্ক সার্কাস কলুটোলা কলাবাগানে জ্বলছে দাঙ্গার আগুন। ওঃ সে সব দিনগুলোর কথা ভোলবার নয়। তারি ভেতর আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে গেল। আর দেখলাম সারারাত জেগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দেয়ালী। তবে রবীন্দ্র নাথ গান্ধির অখণ্ড ভারত নয়। ভারত পাকিস্তান ভাগ হয়ে গিয়ে তবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অবসান। দলে দলে পূর্ব বাংলা থেকে রেফুইজিরা চলে আসতে লাগল। গান্ধীজী একবার শান্তির বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন নোয়াখালীতে। বোধ হয় 'বসুমতী' লিখেছিল, 'হিন্দু নারীর হাতের নোয়া যখন খালি হল তখন বাপুজী গেলেন নোয়াখালী'। দেখেছিলাম তাঁকে লেকের মাঠে। শান্ত অনুত্তেজিত আবেদন, 'আপলোগ শান্ত্ হো যাইয়ে'। এর পরই ঘটনার দ্রুত

অগ্রগতি—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত আগমন, বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ, বুলা ভাই দেশাইয়ের ডিফেন্স নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচার আর নাথুরাম গডসের গান্ধী হত্যা। জলছবির মত এই সব ঘটনা আমাদের কিশোর মনে উদ্বোধনের মন্ত্র বাজিয়ে দিলে—"কদম কদম বঢ়ায়ে যা, খুশি কে গীত গায়ে যা, যে জিন্দ্গী হ্যায় কৌম কী, তু কৌমপে লুটায়ে যা"—আর জাগে নব ভারতের জনতা—এক জাতি এক প্রাণ একতা।" অত রাষ্ট্র-দুর্যোগের মধ্যেও আমরা সেদিন নিরাশবাদী হয়ে পড়িনি, অবক্ষয় দেখা দেয় নি, আজে বাজে নেশা ভাঙ করতে শিখিনি, ব্লুফিল্ম কাকে বলে জানতুম না। অতিরিক্ত সেক্স-কন্শাসনেস আমাদের মানবিক নীতিবোধকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় নি। শাহনওয়াজ ক্যাপটেন ধীলন লক্ষ্মী স্বামী নাথনের দেশপ্রিয় পার্কের বক্তৃতা আমাদের তরুণ তাজা মনের ওপর একটা দূরপনেয় প্রভাব ফেলত। এই মন এই আশাবাদ আর একটা বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনা নেয়েই আশুতোষ কলেজের ফাষ্টইয়ার এসে ভর্ত্তি হয়েছিলাম, উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে। তখন পঞ্চানন সিংহ মহাশয় সবে অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন, সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ছোটখাটো মানুষটি কিন্তু দারুণ দাপট। রেগে গেলে আর রক্ষে নেই।

আমাদের ইণ্টার মিডিয়েট ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন, অমল চৌধুরী। দু'হাতে গ্লাভস। শ্বেতী ছিল। ক্লাসে এসেই রেজিষ্টার খাতা খুলতে খুলতে খুলতে বলতেন, জেন্ট্ল্মেন, মে আই কল দি রোল্স্—। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি- কাঁচা পাকা চুল। সুরেন বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ছাত্র। বাঁশির মত মিষ্টি গলার আওয়াজ। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ট্যুডর পিরিয়ড, ক্যাথারিণ অব এ্যারাগণ হেনরি দ্য এইট্থের সঙ্গে চার্চের দ্বন্দ্ব সব যেন মুহূর্তের মধ্যে ছবির মত দেখতে পেতেম। ইতিহাসের মধ্যে যে এমন শিহরণ আছে তা অমল বাবুর বক্তৃতা শুনে বুঝতে পেরেছিলেম। তখন কলেজে পড়াতেন সত্যেন সেন অম্লান দত্ত—ইকনমিক্স। বাংলার বিভাসবাবু তারাপদবাবু অমিয় রতন অমূল্যধন। ইংরেজি পড়াতেন সোমেশ্বরবাবু, মনীবাবু মোহিনীবাবু এরা। আর সিবিক্স পড়াতেন নীরদবাবু ও ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স পড়াতেন মনি সান্যাল। ফর্সা টক্টকে রং—স্বাধীনতার পর ক্লাসে এসেই বাংলায় বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। তখন চার তলা হয় নি। চৌদ্দ নম্বর ঘরে পার্টিশন পড়েনি। নিচে ব্যায়ামাগার—শেখাচ্ছেন সরসী গাঙ্গুলী মহাশয়। সংস্কৃত পড়াতেন আশুবাবু শিববাবু শচীনবাবু। রঘুবংশ ভট্টি কাব্য পড়তে পড়তে একটা আশ্চর্য সাহিত্যের স্বাদ পেতাম।

কলকাতার রাস্তাঘাট তখন এমন ছন্নছাড়া ভাঙ্গাচোরা ছিল না। ট্রাম যেত হাঁসের মত নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে। কলেজের সামনে দিয়ে যেত জেড্কা কম্পানীর দু'তলা বাস—সব মিলে মিশে রোদ ঝলমল আমাদের সেই সদ্য যৌবনের তপ্তসরস দিনগুলি, কলেজের করিডোরে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ানো, ক্লাস ঘরের জানালা দিয়ে হাজরা পার্কের অবিশ্রান্ত বর্ষন দেখা সব যেন আজ কবিতার মত মনে হয়—একটা গান তখন খুব গাইতুম- "যদি তুই বাসবি ভাল, ও তোর ভালবাসার ধন, তবে আপনারে তোর জ্বলতে হবে ধূপের মতন।"

কলেজে ভর্তি হয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা বয়সের ঋতু সব কেমন বদলে গেল। আমরা বড় হয়ে উঠছি বেশ বোঝা যেত। ছোট ভাইদের বয়সী পাড়ার ছেলেদের প্রগলভতা দেখলে ধমক দিতাম। কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা প্রতুলদা জ্যোতিষদা এঁদের তেমনি সম্ভ্রম করতাম। তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের খুব দাপট—কম্যুনিষ্ট পার্টি একটু একটু সাড়া জাগাচ্ছে। কিন্তু আমার ওঠা বসা বেশির ভাগই ছিল আমার যে সব বন্ধুরা গান বাজনা থিয়েটার করত আবৃত্তি করত কিংবা খুব ভাল খেলত তাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে পড়ত চিন্ময়। রবীন্দ্র সঙ্গীতে ভারী মিষ্টি গলা। ইন্টার মিডিয়েট ক্লাশে পড়ার সময়েই রেডিওতে প্রোগ্রাম করল—'তুমি কোন সকালে ডাক দিয়েছ কেউতো জানে না।' গতবছর সাতাশে জুলাই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় মারা গেছে। ভাবতেই পারিনা—আমাদের প্রথম যৌবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী চিন্ময় আজ আর নেই। কত নাম করল, কিন্তু ষাটের কোটায় পা দিতে না দিতেই চলে গেল। কলেজে পড়ার সময় ও আমি দেবতোষ (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে) সমীর দত্ত (বাচ্চু) অরবিন্দ হালদার—এক এক দিন চলে যেতাম হরিশ মুখার্জি রোডে ব্যারিষ্টার বি. সি. ঘোষের বাড়ী। ওই বাড়ীর ছেলে কমল আমাদের সঙ্গে পড়ত। আর পড়ত দীর্ঘকায় গোলকিপার প্রসূন চৌধুরী—কালীঘাটে খেলত। আর পড়ত অমর মিত্র—এখন যোগমায়া দেবী কলেজে ইংরেজির প্রোফেসর। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মশায়ের ভাইপো অশোক সেন পড়ত—ডাক নাম তাতার। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী,—এখন শান্তিনিকেতনে বাংলার রীডর প্রোফেসর, খুব ভাল ছাত্র ছিল, ইন্টার মিডিয়েটে নাইনথ হল।

বি. এ. ক্লাসে বাংলায় অনার্স নিলাম। একজন নতুন অধ্যাপক এলেন, সত্যকিংকর মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী পড়াতেন। অমিয়রতন, মিষ্টভাষী দারুণ ভাল বক্তা—রবীন্দ্র কাব্য পড়াতেন। আর তারাপদ ভট্টাচার্য মশায় মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র পড়িয়ে ছিলেন অনার্সে,—বৈষ্ণব কাব্য পড়াতে এসে বললেন, কৃষ্ণলাল গান সোনাও, থতমত খেয়ে গেলাম। অনার্স ক্লাসে গান গাইব! কিন্তু ওঁর আদেশ শিরোধার্য করতেই হল। গাইলাম, 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'।

এমনি সব জমাটি ব্যাপার। হাজরামোড়ের কাছে ছাত্র নেতা মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন, আবদুল সালাম। রসিদ আলি দিবসে লাঠিচার্জ হল হাজরা পার্কে। ছাত্ররা এই সময় গর্জে উঠল—"কালা কানুন চলবে না!" ব্লাক ল' পাশ হচ্ছিল—সিকিওরিটি এ্যাকট। স্বাধীন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ খুব আন পপুলর হয়ে গিয়েছিলেন। ওদিকে পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর পুলিশ বাহিনী নিয়ে কলেজ চত্বরে ঢুকতেই প্রিন্সিপ্যাল সোমেশ্বরবাবু ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন পুলিশকে—হৈ হৈ ব্যাপার! বাংলার বাঘ স্যর আশুতোষের কলেজ যে!

বি. এ ক্লাসে পড়বার সময়কার আর একটা ঘটনা মনে পড়লে দারুণ হাসি পায়। প্রথম সিগারেট খাওয়ার কথা, একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে আনাড়ীর মত হাজরা পার্কে বসে টানছি একখানা দৈনিক বসুমতী আড়াল করে। সে একটা দারুণ থ্রিল! খক্ খক্ করে বারকয়েক কাশি আর তেঁতো ধোঁয়া উদ্গীরণ। ভয়ে বুক টিপ টিপ করছে। যদি কোনো অধ্যাপক দেখে ফেলেন।

সেই সব উষ্ণ-উত্তেজনাময় দিনগুলিকে কখনো কখনো মনের কোনে একটু আধটু উঁকিঝুঁকি দিতে দেখি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় চোখে পড়ে আমার কলেজের ছেলে-মেয়েরা—আমার ছাত্র-ছাত্রীরা অকারণ হৈ হৈ করতে করতে মৌমাছির চঞ্চল পাখনায় উড়ে যাবার মত তরতর করে নেমে যাচ্ছে। তখন মনে হয় ওই চঞ্চল সপ্রতিভ চোখ মুখের ভেতর আমার কৈশোর যৌবন আজও দিঘির মত টল টল করছে!

"শুনি যেন কানন শাখায়
বেলা শেষের বাজায় বেণু;
সাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণ ভরাগন্ধ রেণু

এই সব স্মৃতির মত মধুর আর কি আছে! সবই ত' হারিয়ে যায় "থাকে শুধু অন্ধকার—মুখোমুখি বসিবার"—

বনলতা সেন পড়লেই মনে হয় ওই যে ধূল ছায়া ধূসর অতীতের নারী, যার চুল অন্ধকার বিদিশার মত—সে ত' কোনো শরিরিণী মদিরেক্ষণা নয়, সে যে কবির স্মৃতিলোক বাসিনী একটা চিরন্তন রোমান্টিক স্বপ্ন।

আজকের তেমনি একটা স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্ন মোটেই অলীক নয়। এই স্বপ্ন হয়ে রয়েছে সেই পরিতোষ পাল আর অমিয় চক্রবর্ত্তী। পরি আত্মহত্যা করেছিল বি. এ পড়তে পড়তেই তার চেতলা বাড়ীতে। তার গানের খাতাখানা আটত্রিশ বছর পরে আজো আমার কাছে রয়ে গেছে। সিল্কের পাঞ্জাবী, ধূতি, হাতে আংটি আর সোনালী ফ্রেমের চশমা পরে কলেজে আসত পরিতোষ! 'খেয়ালী' নাম দিয়ে গান লিখত। আর অমিয় আত্মহত্যা করেছিল কলেজের তিনতলা থেকে লাফিয়ে। তখন আমরা পাশ করে গেছি। খুব ভাল রাশিয়ান জানত। দাদা অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী ভাল সাহিত্যিক। অমিয় শেখভের গল্পের অনুবাদ করেছিল মূল রাশিয়ান থেকে। চক্রবেড়িয়া সাউথ এ থাকত। ওসবই ত স্বপ্ন—"থাকে শুধু অন্ধকার—মুখোমুখি বসিবার।

আর ওই স্বপ্নিল বালু বেলার তীরে হারিয়ে গেছে কমল রায়। অশেষ চাটুজ্জে আর কমলের মধ্যে দারুণ ভাব ছিল। অশেষ যখন শান্তিনিকেতনে—ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সাংবাদিক প্রতিনিধি। দু'জনেই ভাল ছবি আঁকত। হ্যাঁ অঙ্কিত বক্সীও খুব ভাল স্কেচ করত। কমলটা কোথায় হারিয়ে গেল। পিছনের বেঞ্চিতে বসে কমল প্রোফেসরদের স্কেচ করত। অনেক দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও ছবি আঁকাটা ছাড়ে নি। প্রদোষ দাসগুপ্তের শিষ্য কমল, কল্যানী কংগ্রেসের তোরণ বানিয়েছিল ম্যাটিং-এর কাজ করে। পণ্ডিত নেহেরুর চোখে পড়ে গেল। ব্যস্, আর পায় কে। স্কলারশিপ নিয়ে সোজা ইংলণ্ড।

সেখানে সোয়ানশিয়া কলেজের অধ্যাপক হল! ওর সমস্ত ভাস্কর্য গিয়ে পৌঁছেছিল জার্মানীতে! ওর প্রদর্শনী আসন্ন। এমন সময় দেখা গেল ট্রেনের কামরায় কমলের দেহ ঝুলছে। আত্মহত্যা করার মত কি এমন ঘটেছিল কমলের। শর্বরী বললে, প্যারিশে কমলদার সঙ্গে কত গল্প হল, এ ত' ভাবতেই পারছি না। মনে পড়ল ছিজেন আমি আরো দু'একজন কমলকে ফেয়ারওয়েল দিতে হাওড়ায় বোম্বাই মেইলে তুলে দিয়ে এলাম। আর অমিওর সেই মরণ—লাফ দেবার মর্মান্তিক দৃশ্য! কলেজের গেইট দিয়ে তখন প্রিন্‌সিপ্যাল সোমেশ্বরবাবু আসছিলেন। তিনতলায় অমিয় লাফিয়ে পড়ার আগে ওর চশমা চটি জুতো খুলে রেখে ছিল! রাস্তা থেকে একজন আইসক্রীম ওয়ালা দেখতে পেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল!

গোপিকা আর আমি সেদিন বিকেলে গিয়ে হরিশ পার্কে বসে সব জিনিসটা গুছিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেম। কেন এমন হয়—; অমিয় কমল পরিতোষ যতই এদের কথা ভাবি ততই মনে হয় কেন এরা জীবনকে এমন করে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল—

"যে মানুষ খোঁজে অন্ধকার স্নায়বিক ঘোরে—
মৃত্যু, একঘেয়ে ঘোরে ভাবে অত্মহত্যাই কেবল
তার সমাধান, সেই লুপ্ত মনে চলেছে অনেক পথ
অনেক ঘণ্টাই, অন্যমনস্কের অতিকায় জোরে।"

★ ★ ★

পঞ্চাশ সালে এই কলেজ থেকে বি এ পাশ করে গেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে বাংলায়। শ্রীকুমারবাবু, শশিবাবু, প্রমথ বিশি, বিশ্বপতিবাবু—এঁরা সব বাংলা পড়াতেন। তখনকার সেই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আজকের তুলনা হয় না। এত মিছিল পোষ্টার আর বক্তৃতার আওয়াজ মাইক্রোফোন চীৎকার চেঁচামেচি তখন ছিল না। পঞ্চাশের দশক—যেন অনেক দিক থেকেই সুস্থ ও স্বাভাবীক। অথচ আমরা তখন অনেকটা রোমান্টিক ভাববিলাসিতা ফেলে সুকান্তর কবিতা পড়ছি গণনাট্য সঙ্ঘের গান গাইছি, বহুরূপীর নাটক দেখছি। রবীন্দ্রনাথকে মাথায় রেখে তারাশঙ্কর বিভূতি ভূষণ জীবনানন্দ মানিক বাঁড়ুজ্জের লেখা পড়ছি। আশ্চর্য স্বপ্নমেদুরতায় টানছে—বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর আর রবীন্দ্রনাথের গান। সেই সময় অজয় ভট্‌চার্য, প্রবি রায় মোহিনী চৌধুরী—এঁদের গানও খুব জনপ্রিয়—হেমন্ত জগন্ময় ধনঞ্জয় শচীন দেব বেচু দত্ত গৌরী কেদার সুধীরলাল এঁরা আধুনিক বাংলা গানের আকাশে রামধনু এঁকেছিলেন। "এই সেই বকুল তলে আগেরি মতন, বোসো প্রিয় মোর কাছে—দেখো তোমার আঁখির মত দ্বিতীয়ার চাঁদ—তব মুখ পানে চেয়ে আছে।" এই রোমান্টিক আকাশের নীচে ছিল তপ্ত মাটি—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান, সেই বানের জলে ভাসল পুকুর ভাসল গোলার ধান"—"শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান, আমার ঘরে কন্যা কাঁদে তার কি দিয়ে হয় আহার যোগান।"

যে কলেজে পড়েছি, একাত্তর সালে সেখানেই এসেছি অধ্যাপক হয়ে আর আজ বয়সের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে—আর চার পাঁচ বছর বাদে হয়ত অবসর নেব—তার আগে অতীতটাকে একখানা দামী গয়নার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—, কিছু মনে আছে—কিছু গেছি আজ ভুলে—তবু যেটুকু মনে আছে তার রূপরস বর্ণ সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য প্রত্যয়ী চিত্রের মতো করে যে জীবনটাকে পেয়েছি তার তুলনা নেই। সলিলদা সুকুমারদার সঙ্গে বসে সেসব কথাই হয়। আজ আমাদের আরো একটা ছবির মত ছোট্ট সাজানো কলেজ ভবন হল। এ কি কম আনন্দের কথা! আমার কনিষ্ঠ যে সব সহকর্মীরা রইলেন তাঁদের কাছে একটা আর্জি জানিয়ে যাব—

আজ এই অবিশ্বাসী যুগে ভীড়ে গুমোটে আপনারা ওদের কাছে বিশ্বাসের ছবিখানা তুলে ধরুন ভাই! ওদের মত অসহায় কেউ নেই। কিন্তু একবার ওদের আলোতে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে দেখুন, কি অজস্র সম্ভাবনা আজকের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আপনারা ঢাকনাটা খুলে দিন, সৌরভ আপনিই বেরিয়ে আসবে—

"ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

---

১৭ বছরের কার্লমার্কসের খাতায়—"তোমার জীবনের লক্ষ কি?"—র উত্তরে লেখা ছিল "নিখিল মানব জাতির স্বার্থে যদি নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি তাহলে কোন বাধাই আমাদের পরাভূত করতে পারবে না। সমষ্টির স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছি এই বোধই শক্তি যোগাবে। সেক্ষেত্রে আমরা সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও আত্মসুখপরায়ণতা অতিক্রম করে যাব। নিজের স্বার্থ ভাগ করে নেব কোটি মানুষের সাথে। মৃত্যুর পরেও আমাদের কল্যাণপূত কাজের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকব আর আমাদের চিতাভস্মের উপর ঝরে পড়বে মহৎ মানুষের অশ্রুরাশি।"

যীশুর মুকুট

অনিরুদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়

তাকে থরে থরে সাজানো ছিলো স্মৃতি ;
কোথাও লক্ষ্মীপুজোর গন্ধ,
কোথাও আকাশপ্রদীপ,
কোথাও পায়রাবকম খিলান,
কোথাও বা চায়ের কাপে চামচ নাড়ার টুংটাং।
তারই মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসি,
কে কোথায় বলে ওঠে ব্যাপার রঙ নীল,
আমি মুকুট গড়বো
তাই নীল পালক খুঁজি
তারপর দেখি
আমার গ্রামের প্রতিটি মানুষের মুকুটে।
জ্বলজ্বল করছে নীল প্রালকগুলো॥

চিরসখা

শুচিস্মিতা ভট্টাচার্য

তোমাকে খুঁজতে যারা জনারণ্য থেকে
দূরে,
কোনো নির্জন প্রান্তরের
চিরমৌনতায় আশ্রয় নিয়েছে,
তারা কি কেবলই তোমার পূজারী ?
নাকি কোনো অন্ধ, শঠ, প্রবঞ্চক
ঘুমিয়ে রয়েছে
কোন অজীর্ণ সুখস্মৃতিকে আশ্রয় করে।
তারা কি জানে না
জন্ম থেকে জীবনের প্রান্তে প্রান্তে
তুমিই
তাদের দিয়ে চলেছ
জীবন পাহারা ?
জীবনের ভিক্ষাঝুলি তুলে,
তীর্থে, দেবপীঠে মোক্ষ ফেরি করে
সাধনার জপযন্ত্রে
যারা গড়তে চেয়েছে
প্রেমের ইমারত !
সময়ের দড়ি বেয়ে, নিয়মের গিঁটে
বাঁধতে চেয়েছে তোমার অস্তিত্ব !
তারা কি জেনেছে
সকালে, দুপুরে
তোমারই সাহারা তাদের
হাতে তুলে দিয়ে গেছে
জীবনের মাধবীমঞ্জরী ?
প্রকৃতির মাধুর্য্যে
সকালের রোদ্দুরের স্পর্শসুখে,
তুমিই ছড়িয়ে রেখেছ
তোমার
অফুরন্ত প্রেমের সুরভি।

আন্তঃ কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা। বিচারক— কবি অমিতাভ চৌধুরী

'অনামিত্র এদেশের এক পাভেলের নাম।'

সুশান রায়

অনামিত্র এদেশের এক
পাভেলের নাম।
সে ভালোবাসে
নদীর কুলুধ্বনি, আকাশের রঙ ইত্যাদি ইত্যাদি
এবং মানুষকে।
বাবুই পাখীর ধৈর্য্য নিয়ে
অনামিত্র একটা স্বপ্ন দেখেছিলো—
একজন মানুষের জীবন
শুরু থেকে শেষ
হালের স্বচ্ছন্দে মাটি আলগা
করে চলার মত বাধাহীন।

অনামিত্র কলম ধরে
চিন্তাধারার তাগিদ থেকে।
কেঁপে উঠল মধ্যবিত্তের
চিরন্তন চিন্তার দেওয়াল।
অনামিত্র দৌড়ে যায়
ধর্মঘটী শ্রমিকের পাশে,
অনামিত্র জড়িয়ে ধরে
ভূমিহীনের উপোসী হাত।
পাথর চাপা সময় নাড়িয়ে
তাজা বাতাস ছড়িয়ে দিতে
চায় সে সর্বত্র।

অনামিত্র আজ ফরমেয়েশী
কবিতা লেখে,
সম্মানিত হয় কবি বাসরে।
ফুলের মালা আর ভক্তজনের
উষ্ণ অভিনন্দন পুঁজি করে
(মালিকের দাক্ষিণ্যে)
মারুতি চড়ে, দক্ষিণের ফ্ল্যাটে ফেরে।

দোহাই—
অনামিত্রকে কেউ ভুল বুঝবেন না।
ও আমাদেরই ভাই
এদেশের 'বিপ্লবী' কবি।
ও এখনও ভাবে—
মজুর-ভূমিহীন এক হয়ে
আনবে সার্বিক পরিবর্তন।
তবে, আগে ভাবতো
আগুন মেখে গায়,
এখন ভাবে বাতানুকুল ঘরে।
অনামিত্র এদেশের
এক পাভেলের নাম॥

আদিম কথা

রঞ্জনা ভট্টাচার্য

প্রাগৈতিহাসিক বটের ছায়ায় ছিল
উলঙ্গ জীবন ;
বন্য-জন্তুরা আগুনে গা ঘামাত।
তারপরে আশ্রয় নিত মানুষের গর্ভে।
সবুজ পাতা ঢেকে দিত অশ্লীলতা।
পাথরের দেয়ালে ছবি আঁকত
আদিম সংস্করণ
মানুষের।
তারপর ধাপে ধাপে
প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, লৌহ—
এক একটা যুগের
প্রজন্মের
যাওয়া-আসা।
তাই ইতিহাসের প্রারম্ভ
আমাদেরই শৈশব গাঁথা।
বিজ্ঞান উন্মুক্ত করে—
মানুষের সৃষ্টি রহস্য।
আর আমরা
প্রযুক্তি দিয়ে বানাই
মরণাস্ত্র অস্তিত্বের
চিতা জ্বালাবো বলে।

শিষ্টাচার

রাজীব চক্রবর্তী

এ অন্ধকার শহরে এসব বিবর্ণ
অট্টালিকার উপরে পূর্ণিমার চাঁদ
বড় বেমানান লাগে। ক্ষীণ রক্তবর্ণ
চক্র বেষ্টন করেছে উল্লাস-বিষাদ
ভরা জ্যোতির্মণ্ডলের অনন্ত শুভ্রতা।
আমাদের ভালোবাসা এইভাবে জাগে
শিষ্টাচার-জর্জরিত কর্কশ শুষ্কতা,
আর আর্দ্র অশ্লীলতা, কৃত্রিম সোহাগে
ক্লিষ্ট এ সভ্য সমাজে। চঞ্চল হৃদয়,
দ্বিধাগ্রস্ত ক্লান্ত মন, অস্থির চাউনি,
দনুজসুলভ তৃষ্ণা। চাঁদের আলোয়
অতি নিষ্প্রভ দেখায় উত্তম। পাই নি
যা কিছু তার হিসাব ক্লান্তিতে বিস্মৃত ;
বাকীটা চন্দ্রালোকের ন্যায় অনুভূত।

শিকল ছেঁড়ার দিন এসেছে আজ

অনিন্দ্য বড়ুয়া

আফ্রিকা,
ঐ চেয়ে দেখ, তোমার আকাশে
লাল সূর্য ; ভোর হচ্ছে তোমার বুকে।

আফ্রিকা, ঐ শোন—
পাহাড়ী নদী তোমাকে ডাকছে
ওর তীব্র বেগ কখনও
শৃঙ্খলিত হয়নি ; ও জানে ও
উদ্দাম, ও ভয়ঙ্কর , রণডঙ্কা
বাজে ওর দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে,
তাই তাণ্ডব নৃত্যে
দুকূল ভাসিয়ে জানান দিচ্ছে বারবার :
ও নির্ভীক ; ও নির্দয় ; ও উন্মাদ ;

আফ্রিকা,
সব্বাই তোমার প্রতীক্ষায়—
ওই পাহাড়, ওই নদী, ওই গহন অরণ্য।

আফ্রিকা তোমার স্তব্ধতায়, তোমার মৌণতায়
ওরা ক্লান্ত—
আফ্রিকা, তোমার শৃঙ্খলা ওদের
লজ্জা দেয় ; তুমি আর কেঁদো না
আফ্রিকা ;

আফ্রিকা তুমি জাগো—
রাত্রির গাঢ় অন্ধকার থেকে
ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

আফ্রিকা—
আর কতদিন থাকবে অপেক্ষায় ?
ঐ পাহাড়, ঐ নদী, ঐ গহন অরণ্য
সবাই তোমার নির্দেশের জন্য
দিন গুনছে ; তুমি চেয়ে দেখ
আফ্রিকা আর নেই দেরী :
শিকল ছেঁড়ার দিন
এসেছে আজ !

[আফ্রিকার সেইসব সংগ্রামী মানুষদের মনে রেখে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য আজও আমরণ সংগ্রামরত]

সেই অচেনা অনুভূতির রাজ্যে

অধ্যাপক দেবদাস রায়

মাঝে মাঝে এমন এক অনুভূতির তীব্রতায়
জেগে উঠি,
সব কিছু তুচ্ছ মনে হয় ।।

মাঝে মাঝে এমন এক উষ্ণতার জোয়ারে
ভেসে যাই,
সব কিছু আপ্লুত মনে হয় ।।

মাঝে মাঝে এমন এক শীতলতার কুয়াশায়
ঢেকে যাই,
সব কিছু বিষাদ মনে হয় ।।

মাঝে মাঝে এমন এক গাঢ় অন্ধকারে
মিশে যাই,
সব কিছু অর্থহীন মনে হয় ।।

"নতুন স্বপ্ন"

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিনের ক্লান্তিমাখা ভোর পেরিয়ে
আজ আবার নতুন ক'রে সজীব সূর্য্যকে দেখলাম।
সমস্ত গ্লানি যেন হারিয়ে গেল,
সূর্য্যের ঐ অকৃত্রিম উজ্জ্বল হলুদে।
অনেক আশায় আজ আবার,
নতুন করে বুক বাঁধার ইচ্ছে হ'লো।
নতুন খুশীতে প্রাণের জোয়ারের জল
উপছে পড়তে চাইছে!
মরা মনের গাঙে এবার
ঢল নেমেছে।
বাঁচার নতুন স্বপ্ন,
বাতাসের সুমধুর আঘ্রাণ
আকুল করলো আমায়।
নতুন প্রাণের স্পন্দনে
আপ্লুত হলাম আমি।
আমার আবেগের বাঁধভাঙা বন্যায়
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো
এতদিনকার পুরোনো নিয়মের বেড়াজাল।
আজ নতুন সূর্য্যের সাথে,
বাঁচার স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে হ'লো
রঙীন, উজ্জ্বল, স্বপ্নময়—ভবিষ্যতের!

বিষফুল

শ্রীসঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পুকুরটায় জল নেই, রাজ্যের পানা। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। দেবুদের বাড়ির ছায়া পড়েছে জলে। কেমন ঝিমধরা, নিঝুম ভাব চার দিকে। সুধাময়ীর এই দুপুরটাই অবসর। ছেলেরা যে যার আপিস-কাছারীতে। বড় বৌ বাপের বাড়ীতে। ছোট বৌ নিজের মেয়েকে নিয়ে ঘুমোয়। শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলে না। শুধু বড় ছেলের দশ বছরের রোগা-পট্‌কা ছেলেটা ঠাকুমার ন্যাওটা হয়েছে। পায়ে পায়ে ঘোরে। বিভূতির মেজ ছেলের বৌটা সুধাময়ীকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বলে দাঁড়িয়ে ?

একলা মানুষ। নিজে হাতে রেঁধে-বেড়ে খেয়ে, নেয়ে, কাপড় কেচে উঠতে উঠতে রোজ দুপুর দুটো বাজে। নাতিটা ইস্কুল থেকে ফেরে। ভোরে চান করে দুটো খেয়ে যায়। দুপুরে ঠাম্মার সাথে চাট্টি ভাত খায়।

সুধাময়ী দোরে শেকল তুলে নিজের ঘরবাড়ি দেখে। ভারী মায়া লাগে তার জীর্ণ মাটির ঘরগুলোকে দেখে। বাঁশে ঘুন ধরেছে, অ্যাস্‌বেষ্টসের চাল কতবার মেরামত হল। কি জিনিষই না বানিয়ে দেছিল কত্তা। কত ঝড়-জল-বিদ্যুৎ সয়েও বাঁশের ঝাড় মাথা নোয়ায় নি। ছোট ছেলের ঘরটার পাশের জায়গাটা কেমন ফাঁকা লাগে। ওখানে একটা বিশাল আম গাছ ছিল। সবই কত্তার সৃষ্টি। খুব যত্ন ছিল, বড় ছেলের ঘরের পেছনে বাতাবি লেবুর গাছটায় অনেক ফল ধরেছে। গাছপাকা হয়নি এখনও, হলে আর দেখাও যায় না। ওইতো এক মানুষ সমান বাঁশের বেড়া।

সুধাময়ী নিজের বড় ঘরে শুতে যাওয়ার আগে ঘুরে ফিরে ঘরদোরের অন্ধি-সন্ধি দেখে নেয়। খোলামেলা জায়গা। গাছপালা বন-বাদাড়, আর তিনটে ঘর। লুকিয়ে থাকার জায়গা অনেক। বুড়ি তাই নিজের চোখে সমস্ত কিছু জরিপ করে নেয়। নাতিটা সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। উঠোনে ডাঁই করে রাখা এঁটো-বাসন। একটা কাক তাল বুঝে ভাতের হাঁড়ির ওপর বসেছে। পোষা কুকুরটা শীতের রোদ পোয়াচ্ছে। পেয়ারা গাছটার তলায় এসে কি ভেবে সুধাময়ী আঁকশিটা তুলে নিল। মগডালের কাছে খান দুয়েক ডাঁসা পেয়ারা, নাতিটা বিকেলে খাবে 'খন।

কাঁটাল গাছটার বয়স হয়েছে। মাকড়শার জাল ডালে ডালে সাম্রাজ্য পেতেছে। এ দিকটায় ঝোপ-ঝাড় বেশী। রাতে নাতিটা এদিকে আসতে ভয় পায়। সুধাময়ী বলে, ভয় কিসের। এরা

আমার আপনজন, তোর ঠাকুদ্দার হাতে জন্ম। সেই লাহা বাড়িতে থাকার সময় এ জমির সন্ধান পায় কত্তা। ছ'কাঠা পুরোপুরি। এক পায়ে ভর করা মানুষ। কি তার সম্বল, তার ওপর দশ-বারোটা কচি-কাঁচা ছেলে মেয়ে। একা হাতে, যৎসামান্য পুঁজি ভেঙে, কিছু ধার দেনায় এ ভিটে তৈরী হল। সুধাময়ীর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। গলার কাছটা কি যেন আটকে আছে। এতগুলো ছেলে। কেউ সেই লোকটার শিঁরদাঁড়া পেল না। সুধাময়ী এই নাতিকে মানুষ করবে। ওর মধ্যে কত্তার হাবভাব দেখেছে সে। জন্ম-মিত্যুর কতা কে বলতে পারে। হয়তো কত্তা নিজেই ফিরে এয়েচে নাতি হয়ে। বুড়ি নাতির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে।

বারান্দায় কাঁথাটা মেলে দেওয়া ছিল। রোদ পেয়ে গরম হয়ে আছে। গায়ে দিয়ে চোখ বুজতে না বুজতেই বিকেল হয়ে যায়, চুপচাপ খাটে শুয়ে থাকলে কেউ এসে চালে-ডালে চড়িয়ে দেবে না। এঁটো-বাসন মেজে দেবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শান্তি নেই। মরণও হয় না। কত্তার কত আশা ছিল। ছেলের বৌদের দেখে যাবে। ভালই হয়েছে মুখপোড়াদের চৌপর দিন ধরে দেখতে হয় নি। ওর চেয়ে অন্ধ হওয়া ভালো।

কোনো অজানা পাখীর ডাক ভেসে আসে। পোষা কুকুরটা কি দেখে গর্-গর্ করে। নাতির চোখে ঘুমের আবেশ। হঠাৎই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর থেকে ভেসে আসে। পাতার ঝিনি-ঝিনি সুধাময়ীকে টানে ফেলে আসা দিনের বাঁকে। সে সব কত দিনকার কথা।

কত্তার চেহারা ছিল। পুরনো কলকেতার বাবুয়ানীর গন্ধ ছিল গায়ে। জুঁইফুল, বেলফুলের তোড়া হাতে ইয়ারবক্সীদের সাথে জমিয়ে বসতেন অবরে-সবরে। লাহা বাড়ীতে। উঁচু ঘরাণার মাইফেল বসত লাহাদের বৈঠকখানায়। বেনারস থেকে আনা হত ওস্তাদ মানুষদের। গভীর রাত অব্দি চলত সুরের আলাপ। লাহাবাবুর খুব কাছের মানুষ ছিল কত্তা। এষ্টেটের নায়েব। খাতা লিখে রোজকার। দুজনে পাশাপাশি বসলে বাইরের লোক ভাবত না জানি কোথাকার বাবু। কত্তার সে সময়কার একটা বড়-সড় ছবি সুধাময়ী অনেক যত্নে রেখে দিয়েছে। সেজ ছেলে একবার বলেছিল ওটাকে নতুন করে আনবে। কিছুই করেনি। চাকরী নিয়ে বাইরে চলে গেছে। কানে আসে কোন অফিসের বড়বাবু হয়েছে। মোটর কিনেছে। পাকা বাড়ী তুলেছে। খুব কাজের চাপ। কাজ ছাড়া কলকেতায় আসে না। পুজোয় চিঠি লেখে। ইচ্ছে হলে মাঝে-মধ্যে টাকা পাঠায়। কৃতার্থ করছেন যেন। পাড়ার বৌ-ঝিরা বলে, বড়দি, এগুলো আপনের পোলা-পান? নিমকহারাম।

নাতিটা গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। ছোট্ট বুকটা মন্থরলয়ে ওঠে আর নামে। ভারী মায়াময় মায়ময় মুখের আদল। গভীর কালো চোখ। টিকোলো নাক। ছোট করে ছাঁটা চুল। ছেলেটা বেশী খেলাধুলো করে না। শরীরে দেয় না। দেবে কেন? খায় কি। মাঝে-মধ্যেই দাঁতে দাঁতে লেগে যায়। ডাক্তার বলেছে রক্ত কম। ভাল খাবার দিনে দুবার দুধ, কিছু ওষুধ পত্তোক দিন দরকার।

বাপ-মার রোজকার কম। সুধাময়ী, যতটুকু পারে, নাতিটার জন্য করে। ছেলেটার যত সাধ-আহ্লাদ সবই এই ঠাম্মার কাছে। বাবা মাকে পায়ই না। একা একা থাকে বলে বড় দুঃখী ছেলেটা। সুধাময়ীর চোখে জল এসে গেল। কপালপোড়া ঠাম্মা রে তোর, নয়ত তোর খেলার সঙ্গীর অভাব; এতগুলো মামা তোর, কত ভাই, কত বোন। সুধাময়ীর কত ইচ্ছে ছিল শেষ বয়সে গণ্ডা দুয়েক নাতি-নাত্নীর মাঝে বসে ভূত-পেত্নীর গল্প শোনাবে। কত্তা গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানবে আরাম কেদারায় বসে। গম্ গম্ করবে বাড়িটা। একদিন বুড়ো-বুড়িতে মিলে তীর্থে বেরোবে। তারপর সময় বুঝে টুপ করে ওপাড়ে। অতসুখ কি আর এ অভাগী ব্রহ্মণীর কপালে সয়! মানুষের কত আশা!

কত্তার খড়মটা বড় ঘরের তাকে রাখা আছে। পাশে পড়ে আছে কত্তার গড়গড়া। বহু দিন পরিষ্কার করা হয়নি তাকটা। ধুলো জমেছে অঢেল। নিঝুম বাড়িটায় উত্তরের হাওয়া হু হু করে বয়ে যায়। সুধাময়ী আধো ঘুম—আধো জাগরণে। কোত্থেকে খট্ মট্ করে আওয়াজ ভেসে আসে। যেন কেউ খড়ম পায়ে হাঁটছে। পোষা কুকুরটা ঘুমের মধ্যেই কান খাড়া করে শব্দটা শোনে। বড় ঘরের পেছনের বাগানে বিস্তর শুকনো পাতা জমেছে। পুরু গালিচা। কিসের শব্দে মনে হয় পাতার ওপর কেউ চলে বেড়ায়। সুধাময়ীকে কে যেন ডাকে, মন্দ্রস্বরে, থেমে থেমে, বার বার। রসহীন মানুষ বলবে ও কোনো অচেনা পাখীর ডাক। সুধাময়ী জানে আসল নকল, ও যে কত্তার গলা। কত্তা ডাকে, সুধা, ও সুধা, কেমন আছ গো?

ভাল নেই গো কত্তা। সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কত লোক আমার চারপাশে। কত বড় ভিটে। মাটির গন্ধ, পাতার গাল্‌চে। সব কেমন হু হু করে। একা, বড় একা লাগে। ছেলে-মেয়েরা মাঝে মধ্যে আসে। আবার চলে যায়। যে যার তালে আছে। মাঝখান থেকে নিজে কেমন বেস্তরো হয়ে গেছি। মা হিসেবে, বধূ হিসেবে, কন্যা হিসেবে আমার সমস্ত কর্তব্য সারা হয়েছে। কোথাও হেরেছি, কোথাও জিতেছি। কোথাও সুখ, কোথাও বেদনা, কোথাও বা কিছুই মেলেনি। এইভাবে কত দিন্ কত—দিন ধরে মরে বেঁচে আছি। এবার আমি ছুটি চাই। আমায় ছুটি দাও গো কত্তা।

তুমি চলে গেলে। রেখে গেলে এক কিশোর বট গাছ। আমি মালি হয়ে সে গাছে জল দিলাম। স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে গড়ে তুললাম এক বিশাল বট গাছ। কত তার ডাল-পালা, কত পাতা, কত শিকড়। পথিক ছিল পথে। বলল, বাহ্, কেমন সুন্দর গাছ। একটা ডাল পাড়ি। বলল না এ কার গাছ, এ কার ডাল। গাছ দেখল সে নিজেই নিজের মালিক। আমি ক্ষীণকায় মালী, দূর থেকে সবই দেখলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। স্নেহ যে নিম্নগামী।

কত্তার আরামকেদারাটা বড় ঘরের কোনায় ছিল কোন এক বেআক্কেলে আজনবী টিকটিকি

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ারটার পাশের দেয়াল থেকে একটা হাঁদারাম মথ্‌কে তাক্ করছিল। হঠাৎ কেদারাটা নড়ে উঠল। দুলতে লাগল ধীরে ধীরে। আচ্‌মকা ভয় পেয়ে টিকটিকিটা পা পিছলে পড়ল মাটিতে। তাই দেখে খিল খিল করে হাসল মথ্‌টা। সুধাময়ী আর তার নাতি তখন বড় খাটে দিবানিদ্রায় রত। শীতের হাওয়ায় কোত্থেকে ভেসে এল মৃদু তামাকের গন্ধ। পোষা কুকুরটার লোমগুলো হঠাৎ খাড়া হয়ে গেল। সে ব্যাটা নিজেই বুঝল না কেন!

আবছা ঘুমের দেশ থেকে সুধাময়ীর মনে হল কর্তা যেন বলছে, সুধা তুমি মিছেই কষ্ট পাচ্ছ। মনে আছে, তোমায় শাজাহানের গল্প বলেছিলাম? নিজের ভাইকে খুন করেছিল সে যৌবনে। সিংহাসনের লোভ। সে পাপের সাজা শাজাহান পেয়েছিল তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে। তোমার আমার পুত্র-কন্যারাও বাবা মা হবে। যে গাছের বিজ ওরা বুনবে, সে গাছ ওদেরও ছায়া দেবে না, ফল দেবে না, ফুল দেবে না। দুই আর দুইয়ে চারই হয় সুধা। এই নিয়ম।

বিকেলে বড় নাতি ঘুম থেকে উঠে দেখল তার ঠাম্মা তখনো ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটের পাশে হাল্কা হাসি।

যশের জন্য লিখিবেন না। ..... লেখা ভাল হইলে 'যশ' আপনি আসিবে। ..... টাকার জন্য লিখিবেন না। ..... যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন — তবে অবশ্য লিখিতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন - বাস্তব - জিজ্ঞাসা ?

—শ্রীপ্রিয়জিৎ ব্যানার্জী

সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। আকাশটা যেন আজ সবকিছুকে ভাসিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। রেডিওতে কিন্তু বাজছে, "আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ।" দাদার সবচেয়ে প্রিয় শিল্পীর গলায় প্রিয় গান। দাদা—বছর দুয়েকের ওপর হয়ে গেলো বোধ হয়। আমি তখন ধানবাদে। কাকুরা এমনিই খোঁজ নিত না। এ খবরটা দেবার সময় যে কতদিন পরে হয়েছিল কে জানে। আসলে আমরা তো ওদের গলগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। দাদা বোধ হয় খুব ছোট বেলাতেই এটা বুঝতে পেরেছিল। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখতাম, ও ভীষণ চুপচাপ। ও বোধ হয় একা থাকতে খুব ভালবাসত। পড়াশুনার সময় তো বটেই, এমনি সময়ও ওকে পড়তে দেখতাম। বিভিন্ন লেখকদের লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বই ও পড়ত। ও ভাল ছাত্রও ছিল। স্কুলে ওকে কখনও সেকেণ্ড হতে দেখি নি। প্রতি বছর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শেষে, সবাই অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকত। আর আমি, গর্বের সাথে সেই পুরস্কারগুলো বয়ে নিয়ে আসতাম। আচ্ছা, পুরস্কারগুলো কি এখনও আছে? ও বাড়ী থেকে আসার সময় তো কিছুই আনি নি। সেগুলো হয়তো এতদিনে উইপোকা আর ইঁদুরের পেটে হজম হয়ে গেছে। নয়তো, ...

বৃষ্টিটা বোধ হয় আরো জোরে এল। টানা দু-তিন দিন বৃষ্টি হলেই দাদা কিরকম যেন মুষড়ে পড়ত; বলত, "এ বৃষ্টি শুধু ঝুপড়ির মানুষকে বাইরে এনেই ঠাণ্ডা হবে না; কৃষকের ঘুম কেড়ে, আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তবে ওর শান্তি। মাঠের হলুদ তাজা ফসলকে নষ্ট করে দুর্গতদের দুর্গতি ও আর না বাড়ালে যেন চলছে না। আর ব্যবসাদাররা তো মুখিয়েই আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা বসিয়ে দেবে। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে মনটাকে পাথর বানাতে পারলে তবেই বোধ হয় ব্যবসাদার হওয়া যায়।" কেন জানি না, ব্যবসাদারদের দাদা একদম দেখতে পারত না। বলত, "ওরা তো রক্তচোষার দল, ইচ্ছা করে জিনিষপত্র চেপে রেখে দাম বাড়ায়। ভ্যামপায়ারদের বংশধরের দল মানুষের রক্ত চুষে চুষে তাকে নিজেদের আজ্ঞাবহ দাস বানিয়ে ফেলেছে। ওরা তো ভালমতোই জানে ক্রীতদাসদের কোন মেরুদণ্ড হয় না। যতই দাম বাড়াও, প্রথম প্রথম গাঁইগুঁই করবে, কিন্তু কিনবে ঠিক। ইচ্ছা করে এক এক গুলিতে সবকটাকে শেষ করে দিই।" আসলে ও বোধ হয় সবকিছুকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে চেয়েছিল। সব মানুষের সাথে মিশে তাদের কে বুঝতে চেয়েছিল, তাদের অসুবিধা দূর করে তাদের সুখী করতে চেয়েছিল। মেশার ব্যাপারে ওর কোন বাদ-

বিচার দেখি নি। ও পাড়ার দীপু, কালুদের সাথে যেভাবে মিশত, সেভাবেই কথা বলত শোভনদা, রাণাদাদের সাথেও। কতদিন আমায় বলেছে, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা শুভ্র চেতনাবোধ লুকিয়ে থাকে। সেটাকে অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে আনতে পারলেই দেখবি পৃথিবীটা স্বপ্নের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে।" বড়কাকা কিন্তু এই আলোয় ফেরার ব্যাপারটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেন নি। দীপুদের সাথে ধরা পড়ার পর জামিন দিয়ে তিনি সরাসরি ওকে তাড়িয়ে দেবেন বলে ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু ও প্রথমটায় ছিল বেপরোয়া। অথচ পাঁচ-ছ'দিন পরেই দেখি ও কিরম যেন মন-মরা হয়ে গেছে। ওর কাছেই শুনেছিলাম, দীপুদের বাড়ীর লোকেও নাকি প্রথম প্রথম ব্যাপারটা মেনে নেয় নি। কিন্তু পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা। দীপুর ছোট বোনটার টিবি না কি যেন হয়েছিল। বাবার রোজগারে সংসার চালিয়ে, বাড়ী ভাড়া দিয়ে প্রতি মাসেই ধার করতে হত, তার ওপর ওষুধ, চিকিৎসা। দীপু কিন্তু বেশ ভালভাবেই B.Sc পাশ করেছিল। কিন্তু B Sc. পাশ করে চাকরি পাওয়া মানে তো হাতে চাঁদ পাওয়া! টিউশানীর ঐ কটা টাকায় আর কি হয়। নিজের হাতখরচা আছে, তাছাড়া শ্রাবণীর জন্যেও তো কিছু করতে হয়। যদিও ও বারণ করে, তবু চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। অফিসে "NO VACANCY" বোর্ড, বাড়ীতে ছোট বোনটার খক্ খক্, মায়ের গঞ্জনা —সব যেন কিরকম অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ঘণ্টেদা যখন ডাকলেন, বললেন, শুধু পাইপগানটা ধরে চেনটা টানলেই চলবে"—দীপু আর ভাবতে পারে নি। তার বোন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। মাও গঞ্জনার বদলে শরীরের যত্ন নিতে বলে। এখন ওরা খুব সুখী। শুধু শ্রাবণী ওকে এখন ভীষণ ঘেন্না করে। বাড়ীতে পুলিশ এলে বাবার মেজাজটা একটু।.....

রাস্তায় লিপ্টুদার ছেলেটা জলে নৌকা ছাড়ছে আর খিল খিল করে হাসছে। দাদাও এরকম করে হাসতে ভালবাসত। অনেকদিন দেখেছি দাদা ঘরের মধ্যে একা একা হেসে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলতো, "Laugh and be merry better the world with a song—হাস্য আমার প্রধান সখা অশ্রু আমার কেহই নয়।" সেই হাসিতে আমি জীবনের ঝলক দেখতে পেতাম। দাদা বলত, যে মানুষ মন খুলে হাসতে পারে তার থেকে সুখী আর কেউ হয় না। কিন্তু দাদা কি সুখী ছিল? ওর একটা খাতার শুরুতে লেখা থাকতে দেখেছি।—

আমারে পাছে সহজে বোঝ, তাই তো এত লীলার ছল
বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল ।।

কিন্তু দাদার দুঃখটা যে কোথায় সেটাই বুঝতে পারতাম না। সব সময় দেখতাম ও যেন কি সব চিন্তা করছে। সব কিছুকে ভেঙে নতুন করে গড়ার একটা মানসিকতা ওর ছিল। ও ছিল ভীষণ খুঁতখুঁতে। একটা জিনিষ যতক্ষণ অবধি ওর মনোমত না হচ্ছে, ততক্ষণ ও শান্তি পেত না। কত তুচ্ছ কারণে কত রাত যে ও জেগেছে তার হিসাব নেই। সেজন্যই কি ও সমাজটাকে ভেঙে নিজের মত করতে

চেয়েছিল? সবকিছুকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিল? কিন্তু সবার আগে যে তুমিই ভেঙে পড়লে দাদা! তোমার তো শক্তি ছিল, সাহস ছিল, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল। তবে কেন তুমি হেরে গেলে দাদা? তবে কি ওরা আরও শক্তিশালী? সত্য, ন্যায়, মনুষ্যত্ব—এ সবের চেয়েও বেশী ক্ষমতাবান?

সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে হঠাৎ শম্পাদির সাথে দেখা। শম্পাদিকে দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে, আর একটু মোটাও বোধ হয় হয়েছে। মাথায় গোল করে আঁকা সিঁদুরের টিপ, কোলে মাস-ছয়েকের একটা ছেলে। শম্পাদিকে দেখলেই বোঝা যায় ও এখন ভীষণ সুখী। ওর মুখের হাসি, দেহের ভঙ্গী—সবকিছুতেই যেন একটা চলকানো খুশীর ঝিলিক। ছেলেটাকে কোন মতে সামলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "ভাল আছো তো। দাদার খবর কি? এই শম্পাদিকে দাদা ভালবাসত, ভীষণ ভালবাসত। কখনও কখনও আমার ভীষণ রাগ হত, হিংসা হত শম্পাদির ওপর। আসলে, আমি বোধ হয় চাইতাম আমার দাদা শুধু আমারই থাক। আমার সামনে অন্য কেউ দাদার উপর অধিকার ফলাবে এটা যেন ঠিক মেনে নিতে পারতাম না। কিন্তু শম্পাদিকে দেখলেই মনটা যেন কিরকম হয়ে যেত। বহুবার দেখেছি, দাদার উচাটন মনকে শম্পাদি কত যত্নে শান্ত করেছেন, দাদার পাশে দাঁড়িয়ে সর্বদা ওকে লড়ার শক্তি জুগিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। দাদার সব অসুবিধা, সব চিন্তাকে নিজের করে নিয়েছেন, দূর করার রাস্তা বার করেছেন। একবার দাদাদের অফিসের ইউনিয়নের একটা লোক অ্যাক্সিডেন্টে একদম শয্যাশায়ী হয়ে গেল। অথচ মালিকরা একটা পয়সাও সাহায্য করেন নি। কিছু করতে পারে নি ইউনিয়নও। দাদা, তখন সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে, অক্লান্ত চেষ্টায় লোকটাকে সাহায্য করা শুরু করে। দাদার মুখে ঘটনাটা শুনে শম্পাদিকে নিজের গলা থেকে সোনার চেনটা নির্দ্বিধায় খুলে দিতে দেখেছিলাম। অথচ আমি পাঁচটা টাকাও দিতে পারি নি। ওর ভালবাসার পাশে নিজেকে বড় স্বার্থপর, বড় আত্মকেন্দ্রীক মনে হচ্ছিল। আর দাদাটাও যেন কি! এমনভাবে চেনটা নিল যেন সেটা ওর নিজেরই সম্পত্তি, শম্পাদির বা অন্য কারুর কোন স্বত্ব যেন তাতে কোন দিনই ছিল না। আমার টাইফয়েডের সময়ও শম্পাদিকে দেখেছি। দাদা অফিস চলে যাবার আগেই ও আসত। সারাদিন ধরে আমার সেবা করত। যে কোন সময় হাজির ছিল। ঠিক সময়ে আমায় খাওয়াতো, ওষুধ দিত, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সব সময় আমার কষ্টকে লাঘব করতে চাইত। তখন ওর সহ্য ক্ষমতা, সাহস দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ওর স্নেহের স্পর্শে মার কথা মনে পড়ে যেত। তখন আবার দাদাকে ভীষণ, ভীষণ হিংসা হত। কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু কি-রকম যেন বদলে গেল। ওদের শপথ, প্রেম-ভালবাসা—সব যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেল। একটা ছোট্ট ঢেউয়ের দোলায় উল্টে গেল ওদের স্বপনতরী। আসলে প্রেম বোধ হয় মেয়েদের কাছে একটা নিতান্তই আটপৌরে শাড়ীর মত বৈচিত্রময়। তার রঙ বড় তাড়াতাড়ি উঠে যায়। যখন ভিতরের আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে তখন বোধ হয় সেই শাড়িটাকে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়

থাকে না। দাদা বলত "ছেলেদের কাছে প্রেমই হচ্ছে জীবনের দুর্লভ বিলাস, গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ীর মত ঐশ্বর্যময়। যে পায়, সে অনেক দাম দিয়েই পায়।" প্রেমের জন্যে আজকের যুগে কে কতটা দাম দিয়েছে জানি না, কিন্তু দাদাকে বোধ হয় সব কিছুই দিতে হয়েছিল। না—হলে একটা সুস্থ, প্রাণবন্ত জীবনে এভাবে কালবৈশাখীর অন্ধকার নামে! হঠাৎ করে সেদিন ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল শম্পাদিকে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন অন্য সবার মত হলে? তুমি তো সকলের চেয়ে অনেক, অ-নে-ক আলাদা। অথচ সবাই যা বলল তুমিও তাই মেনে নিলে। একবারও সবাইকে হারিয়ে দিয়ে জেতার ইচ্ছা তোমার হল না? ওরাও বলল, আর তুমিও মেনে নিলে যে, দাদা পাগল !!! কোথায় গেল তোমার বিশ্বাস, তোমার বোধশক্তি? তোমার ভালবাসায় না একদিন তুমি গর্ব অনুভব করতে? কোথায় গেল তোমার সেই ভালবাসা? দাদা বোধ হয় একমাত্র তোমায় ভালবাসার ব্যাপারেই পাগল ছিল। কিন্তু তুমিও ওকে বুঝতে চাইলে না। কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত আকাঙ্খা যে ওর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল, তা তোমরাও অজানা রয়ে গেল। অথচ তোমার একটু স্নেহ, একটু স্পর্শ, একটুখানি সহানুভূতি হয়তো ওকে ঠিক করতে পারত। কিন্তু তুমি এ সবের ধার দিয়েও গেলে না। কেন গেলে না শম্পাদি? তবে কি তুমি ভয় পেয়েছিলে? জীবনের সাথে নিরন্তর সংগ্রামে কি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে? সুখী, নিশ্চিন্ত জীবনের হাতছানি কি তোমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল?

কাদের বাড়ীতে যেন ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। বেশ সুন্দর একটা গন্ধ ছেড়েছে। দাদাও ইলিশ মাছ দিয়ে খিচুড়ী খেতে ভীষণ ভালবাসত। আচ্ছা, ও কি এখনও শম্পাদিকে ভালবাসে? এখনও কি তেমনি করে সমাজকে নিজের পছন্দমতো গড়ে তোলার রাস্তা খোঁজে? সবাইকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার স্বপ্ন দেখে? ও কি এখনো কবিতা লেখে? এখনও কি হাসতে হাসতে বলে, "Laugh and be merry better the world with song". পাগলে কি এতসব ভাবতে পারে? আর যদিও ও এসব ভুলে গিয়েই থাকে, তাহলেই বা কি? অনেকেই তো এসব জানে না, জানলেও ভুলে যায়। তারা কি সবাই পাগল? তাহলে তো পুরো দেশটাকেই একটা পাগলা গারদ বলতে হয়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ত-বে?

বৃষ্টিটা কিন্তু এখনও সমান জোরে হয়ে চলেছে।

The storm is onlypostponed. The storm will break ; if not today then tommorow. The longer it is delayed, the more violent it will be

— রোমেঁ রোঁলো

অনন্তযাত্রা

উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি একজন অভিনেতা। অভিনেতা হিসেবেই আমার স্বীকৃতি। বাস্তব সমাজ থেকে চরিত্রগুলো তুলে এনে নিজের গায়ে এঁটে দিই ; সমাজ তাতেই আমায় করতালিতে মুখরিত করে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ আমি মঞ্চের উপর আগাগোড়া সমস্ত পার্ট ভুলে গেলাম। দর্শকরা গালিগালাজ করলো, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর জন্য দায়ী নই। শুধু পার্ট নয় আমি এখন মাঝে মাঝে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পূর্ণ ভুলে যেতে আরম্ভ করেছি। এই বিস্মৃতি রোগের কারণ সম্পর্কে কিছুই জানি না। মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তবে এটাই বড় কথা নয়। আরো বড় ঘটনা আছে যা কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে, আমার ঘুমন্ত অবচেতন মনে। যেন একটা নাটক। আমি একাধারে দর্শক অন্যধারে অভিনেতা।

দেখলাম আমার এই পোষাক আমার গায়ে নেই। তার বদলে পরে আছি একটা নোংরা ছেঁড়া জামা ও ছেঁড়া প্যান্ট। সারা মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। খুব সম্ভবত নেশা করেছি। পাটা অল্প অল্প টলছে। স্বপ্নে নেশা করার ঘটনা আগেও ঘটেছে তবে এইবার যেন স্বপ্নেও একটা প্রাণ পাচ্ছিলাম। একটা অচেনা রাস্তা দিয়ে চলেছি। চারপাশে হাড় কাঁপানো শীত। এই শীতেরও একটা প্রাণ আছে। স্বপ্ন হলেও যেন বাস্তব। এই স্বপ্নিল বাস্তবতার মাঝে সহসা তালভঙ্গ হ'ল একটা ভাললাগা গন্ধে। গন্ধটা জুঁইফুলের। ছোটবেলা থেকেই জুঁইফুল আমার খুব প্রিয়।

যে রাস্তা দিয়ে চলেছি সেটা অনেক দূর অবধি সোজা চলে গেছে। আমি যেন একটা পূর্বনির্ধারিত দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি চারিদিকে কোথাওকোন মানুষ নেই। এক প্রাণহীন স্তব্ধ অবাস্তব পারিপার্শিক। আমি কোথায় চলেছি, অর্থাৎ আমার গন্তব্য কোথায় তা আমি জানি। নিশ্চিন্ত মনে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি। মাথা নিচু করেই হাঁটছিলাম, সহসা চোখ তুলে দেখি একটা ছোট কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই বাড়ির ছাদের আনাচ কানাচ থেকে বেশ কিছু জুঁইফুল উঁকি মারছে। বুঝলাম এর গন্ধই এতক্ষণ পাচ্ছিলাম।

এগিয়ে গেলাম, কাঠের ছোট্ট দরজাটাতে আলতো করে ধাক্কা দিতেই তা খুলে গেলো। ভেতরে দেখলাম একটা গালচে পাতা সরু রাস্তা। ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। কিছুদূর গিয়ে দেখি আর পথ নেই, গালচেটা আটকে গেছে একটা দেওয়ালে। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। সহসা কানে এলো,

অনেকদূর থেকে কে যেন সেতার বাজাচ্ছে। বেহাগের সুর। খুব চেনা। আমার বাবা একজন নামকরা সেতার বাজিয়ে ছিলেন। ছোটবেলায় এই সুর তাঁর হাতে বাজানো শুনলে বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে উঠতো। ছোটবেলার আধো-চিন্তায় বিহ্বল হয়ে যেতাম ওই বেহাগের সুরে। বাবার কাছে বারবার শুনতে চাইতাম ওই সুর। মানে বুঝতাম না, অর্থ বুঝতাম না, সুরের তাল-লয় কিছুই বুঝতাম না, শুধু এক অচেনা আত্মময়তায় বিভোর হয়ে যেতাম। আজ অনেক দিন পরে, অনেক বিস্মৃত অতীত ঠেলে আবার সেই ভাললাগা সুর শুনে মনটা দুলে উঠলো। চোখ দিয়ে অকারণেই ঝরে পড়লো অশ্রু।

ঘুরে দেখলাম দেওয়াল সরে গেছে। তার জায়গায় একটা সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। তাতেও নরম সবুজ গালচে পাতা। সিঁড়ি গুলো যেন আমার পদধুলিতে বক্ষ রঞ্জিত করবার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এও কি স্বপ্ন? শুধুই স্বপ্ন? আমি ক্ষনিক ইতস্ততঃ করলাম। তারপর ধীরে ধরে পা পা সিঁড়ির দিকে। উপরে উঠে দেখি সেখানে একটা আব্ছা আলো জ্বলছে। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা বন্ধ, অন্যটা খোলা। খোলা ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। চারিদিকে এক অস্থির অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে পরিবেশটাকে। বড় রোমাঞ্চকর এই মুহূর্ত, বড় ধূসর এই পৃথিবী। আমি অন্ধকারে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম, কিছুই দেখতে পেলাম না। সেই মোহময় অন্ধকারের গভীরেও আলো নেই। আরো গভীর ভয়াল সৌন্দর্য আমাকে মাদকতার চরম শিখরে উধাও করে দিলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হতে যাব, দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। অন্ধকারে নিশ্চেষ্ট আমি তখন এক অনির্বচনীয় ভাবকল্পে আপ্লুত হয়ে গেছি।

আর ঠিক তখন-ই—হ্যাঁ, ঠিক তখন আমার সামনে দপ্ ক'রে একটা নীল আলো জ্বলে উঠলো। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম সেই আলোর আভার অস্পষ্ট অবয়বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। পরণে তার পূজারিনীর লালরেখাঙ্কিত শাড়ি, গলায় মুক্তোর মালা, কেশগুচ্ছে জুঁইফুলের সারি, স্বপ্নাল আয়ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার সমস্ত শরীর নিথর হয়ে গেল। আমার প্রকাশ ক্ষমতা, বাক্‌শক্তি কে যেন তার অমোঘ বলে হরণ করে নিয়েছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম সেই অপরূপ সৌন্দর্যলীলার প্রতিমূর্তি সেই নারীর দিকে। এই নারীর অসামান্য রূপের মোহেই আমি বিস্মৃত নই, এই নারী আমার বহু পরিচিত বলেই আমি চিন্ময়াবিভূত। অনন্তযুগ ধরে, স্বপ্নে, বাস্তবে যেন এই নারীমুখ আমি দেখে আসছি। হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে অনন্ত মেঘের মাঝে, কন্যাকুমারিকার অপার সৌন্দর্যের মেলায় হারিয়ে গিয়ে ঢেউভাঙ্গার ছন্দে, গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে ভয়চকিত চিত্তে আমি এই নারীমুখ দেখেছি। উদ্বেল হয়ে কাছে ছুটে গেছি, কিন্তু ছুঁতে পারিনি। অর্ধোঘুমের মাঝে স্বপ্নাবিলতার তারঙ্কে ছিঁড়ে দৌড়ে পালাতে গেছি এই নারীর কাছে কিন্তু প্রতিবারই আটকে গেছি, ধাক্কা খেয়েছি। জন্ম জন্মান্তরে, যুগে যুগান্তরে, 'অনন্ত অসংখ্য লোকে-লোকান্তরে' এই নারীমুখের দেখা আমি পেয়েছি, চিনতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। তবু—তবু এক অস্থির ভাললাগা চঞ্চল করেছে আমার চিত্তকে।

এই সেই নারীমূর্তি। আজ আমার সামনে আবার এসেছে। তাড়াতাড়ি কাছে যেতে গেলাম, দূরে সরে গেলো, আরো কাছে গেলাম, আরো দূরে সরে গেলো। এবার সহসা আবার অন্ধকার আমার সামনে তার প্রভাব বিস্তার করলো। সেই নারীমূর্তি উধাও।

চিৎকার করে উঠলাম, "তুমি কোথায়? দেখা দাও। আর একবার। দয়া কর।" অনেক দূরত্বেকে যেন বহুপরিচিত কণ্ঠে জবাব এলো, "আমি আছি, আমি থাকবো, আমি ছিলাম। আমি সৌন্দর্য, আমি পৃথিবী। যার বুকে তুমি জন্মগ্রহণ করেছো। তোমাকে শেষ বারের মত দেখা দিয়ে গেলাম।"

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। কিন্তু—

কিন্তু একি? আমি কোথায়? কোথায় আমার পরিচিত খাট, বিছানা, ঘর? এ যে এক অন্ধকার পরিমণ্ডল! আহ্—কে, কে আমাকে আঁকড়ে ধরেছো। আমাকে ছাড়ো, আমাকে বাঁচাও, আহ্ ছাড়ো, একি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? হে মোহময়ী বসুন্ধরা, যে আমাকে একটু আগে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলে আমাকে বাঁচাও, আমি যাব না! আমি যাব না! আহ্—কি কষ্ট! কি ভীষণ কষ্ট! বিদায় পৃথিবী। বিদায় রূপময়, সৌন্দর্যময়, বিপুল, বিশাল, অনন্ত পার্থিব বাস্তব—বিদায়।"

নিকারাগুয়ার মা-বোনেদের ভুলবেন না। প্রচণ্ড যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অভিযান চলছে। এক দিকে দেশ রক্ষা, আর এক দিকে দেশ গঠন চলছে। .....জন্ম নিচ্ছে বিপ্লব। একে হত্যা করতে এক বাজপাখী ওৎপেতে আছে। সেই বাজপাখীর নাম মার্কিন সাম্রাজ্য। এই শিশুকে আমরা একা রক্ষা করতে পারব না। আপনাদেরও সাহায্য করতে হবে।

হালিয়া লোপেজ—(বিপ্লবোত্তর নিকারাগুয়ার প্রথম রাষ্ট্রদূত)

মা ও মাটি

আশিষ কুমার চন্দ্র

ই লখাই ইটা কুতবড় ইষ্টিশানরে ·· ইটার লাম কি আছে রে। হাওড়া ষ্টেশনের বিশাল জনমানবস্রোতে দুখিয়ার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেলেও তার ছেলে লখাইএর কানে ঠিক পৌঁছায়। ·· তু জালিস লাই ইটার লাম হাওড়া আছে বটে। ট্রেনের কামরা থেকে পুঁটলি দুটো নামাতে নামাতে উত্তর দিল লখাই। এক হাতে একটা পুঁটলি ও অন্য হাতে মায়ের একহাত শক্ত করে ধরে লখাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। হাওড়া ষ্টেশনের আধুনিকতার ঝকমকে আলো তাদের মা ও ছেলের প্রতি অঙ্গ ও শরীরে প্রতিফলিত হয়ে বিস্ময়ের ছটারূপে প্রকাশপায়। লখা ই লখা উটা কি আছে রে, সব সামনে ভীড় করে দিখছে চল, চল মুরাও দিখি গিয়ে। দুখিয়ার চোখে পড়ে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলা দেখতে ব্যস্ত টি. ভি-র সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অগুনতি লোক। তু জালিস লাই উটা মুদের গাঁয়ে সরকারবাবুর ঘরেতেও আছে। উটাতে ফিলিম্ দিখায়, এতে দুখিয়ার কৌতুহল কিছুটা মেটে। তবে তু যে বুলেছিলি উসব দিখানোর জন্যে শহরে সব বড় বড় ঘর আছে। এবার মায়ের কথায় বিরক্ত হয় লখাই—উ তুকে সব বুঝতে হবে না। টিকিট চেকারের হাতে দুজনের দুটো টিকিট দিয়ে ওরা আস্তে আস্তে সাবওয়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে এক সময় বাসষ্টাণ্ডে এসে পড়ে। লখাইকে অবশ্য এর মধ্যেই তার মায়ের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। নিজের সংকীর্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডারে যেগুলো ধরা পড়ে সেগুলো সে সাধ্যমত জবাব দেয়। বাকিগুলোর মধ্যে খালি বিরক্তিই প্রকাশ পায়। ···· আচ্ছা আমরা কুথায় যাব রে লখা? এবার লখাই সত্যিই চিন্তায় পড়ে যায়। দারিদ্রের স্রোতে ভেসে যাওয়া এক টুকরো কাঠের মত অবশিষ্ট এক ফালি জমি যা তাদের শেষ সম্বল সেটুকু বন্ধক রেখে ভাগ্যান্বেষনে আজ তারা শহরের পথে। অনেক আশা নিয়ে আজ সে এসেছে শহরের পথে। কিন্তু চতুর্দিকে অগুনতি মানুষের গরম নিঃশ্বাস ও অসংখ্য গাড়ীর কালো ধোঁয়ায় সে অন্ধকার দেখে। আস্তে আস্তে এক সময় তারা হাওড়া ব্রীজের মধ্যিখানে এসে পড়ে। দেখ দেখ, লখা কুত বড় ই নদী ইটার শেষ কুথায় রে। ই মুদের গাঁয়ের নদীর থিকেও কুত বড়, আর কুত বড় বড় নাও রয়েছে দেখ। লখাইও দেখে সত্যিই অবাক হয়। চল, আম্মা মুরা কিছু খেয়ে লিই এবার, বহুত ভুখ লেগেছে রে। পেটের জ্বালায় কালো পাথরে খোদাই করা লখাইএর শরীর যেন একটু ছটফট করে ওঠে। ···· উ কালো কালো উগুলো কিনারে কি ভাসছেরে লখা, লখাইএর ক্ষুধাতুর কাতরোক্তিও কানে যায় না দুখিয়ার। বাধ্য হয়ে ফুটপাতের একধারে বসে পড়ে লখাই, এক হ্যাঁচকা টানে দুখিয়াকেও টেনে নিজের

পাশে বসায়, নিজের পুটলিটা খুলে অতি সন্তর্পনে একটা থলি বার করে লখাই। মায়ের কাপড় ও নিজের ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে বানানো এই থলির মধ্যেই আছে তাদের শেষ অবলম্বন টুকুর আর্থিক মূল্য পঞ্চাশটা টাকা। থলির মধ্যে থেকে একটা টাকা বার করে নিয়ে ছুখিয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে ছুখিয়ার হাতে একটা প্যাকেট নজরে আসে লখার। বাড়ী থেকে আসার সময় ছুখিয়া কিছুটা ছাতু সঙ্গে করে আনে তারই প্যাকেট এটা। এতক্ষনে মায়ের উপর বিরক্তির বোঝা কিছুটা হালকা হয় লখার। এখান থেকে একটা টাকা খরচ করতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল লখার। যতদিন না কোনো কাজ পাচ্ছে ততদিন এই কটা টাকাই তাদের সম্বল। চতুরর্দিকে দোমড়ানো একটা লোটাতে জল আনতে ছোটে লখাই, ফুট পাতের একধারে বসে থাকা ছুখিয়া ততক্ষনে সযত্নে প্যাকেট খুলতে ব্যস্ত। খেয়েদেয়ে ওরা আবার উঠে দাঁড়াল, আবার শুরু হল যাত্রা। এ যাত্রার যাত্রী মাত্র ছুজন। সহায়, সম্বলহীন, বাস্তুহারা ছুই যাত্রী জানেনা তাদের এই যাত্রার শেষ কোথায়। মনের এক নিভৃতকোণে একটুখানি মাত্র আশাকে সম্বল করে তারা এগিয়ে চলে। এ যেন পেছনে ফেলে আসা শতাব্দির ছুজন প্রতিনিধির বর্তমান শতাব্দির গতির সঙ্গে তাল রেখে চলার এক অদম্য প্রচেষ্টা।

খানিকদূর যাওয়ার পরই লখাই এর চোখে পড়ে এক জায়গায় তারই মত কিছু লোকে একটা বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যস্ত। কোমরে একটুকরো কাপড় কোনমতে জড়ানো, একদল মানুষ খালি গায়ে, ইঁট, চুন, বালি, সুরকি ইত্যাদি মাথায় করে নিয়ে বাঁশের তৈরী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যে যার সব আগের জায়গায় ফিসে আসছে। এরাও হয়ত কোনো গ্রামের ছুখিয়া কোন গ্রামের লখাই এরা জানে না কাদের জন্য তাদের এই নিরলস, অক্লান্ত, পরিশ্রম। যুগ যুগ ধরে এই ছুখিয়া, লখাইরাই সভ্যতার বেদীমূলে তাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করে তাকে সুন্দরের সার্থকরূপ দেয়। ·····তু ইখানে দাঁড়া ছুখিয়াকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছুরু ছুরু বুকে লখাই এগিয়ে যায়, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কাজ তত্ত্বাবধানকারী বাবুর কাছে। ই বাবু, ·· ই বাবু, ·· গোর লাগি বাবু। তত্ত্বাবধানকারী সম্বিত ফিরে পেয়ে লখাইএর পানে তাকায়, স্বপ্নক্ষন পরেই তার কর্কশ কণ্ঠের সুতীব্র তিরস্কারে একটু পিছিয়ে আসে লখাই। ·· উ সব কাম হামি পারব বাবু। ·· বাবু গাঁয়ে হামাকে বলে হামি লাকি দশজনের কাম একা করতে পারি। তত্ত্বাবধানকারীর অভ্যস্ত কানে ও মনে লখাইএর কাতর আবেদন কোন রেখাপাত করতে পারে না। হতাশা ও ব্যর্থ আবেদনে লখাইএর সুঠাম, সবল, সতেজ দেহ যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ·· আরে ওই ·· ইদিকে শুন, তোর নাম কি আছে? পিছন থেকে তত্ত্বাবধানকারীর ডাকশুনে আনন্দে চোখ ছুটো ছলছল করে ওঠে লখাইএর। ·· মুর নাম লখাই আছে, সোৎসাহে জবাব দেয় লখাই। · বিশ রুপিয়া নিকাল তত্ত্বাবধানকারীর কথায় কিছুটা হকচকিয়ে গেল লখাই। তারপর কি ভেবে এক দৌড়ে চলে আসে ছুখিয়ার কাছে, পোঁটলা থেকে সেই থলিটা বার করে কুড়ি টাকা গুনে নিয়ে দৌড়ে চলে যায় তত্ত্বাবধানকারীর কাছে। ছুখিয়া কি একটা জিজ্ঞাসা করল কিছুই কানে গেল না লখাইএর। খানিক বাদে

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসে লখাই, ·····উ···শালা হামার থেকে বিশঠো রুপিয়া নিল, ···তু উকে দিলি কেনে, দুখিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারে না, - বদলে উ হামাকে কালসে কামনে আসতে বলল। ···চল আম্মা আজ রাত কুথায় কাটিয়ে দিয়ে কাল সুভাসে ইখানে চলে আসব, ···হামি কাম করব আর তু উখানটায় বসে থাকবি। সকালের অবশিষ্ট ছাতুটুকুতে দুজনে কোন রকমে আহার সেরে আগামী কালের সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে দুজনে নিশ্চিন্দে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুনোনোর জন্য অবশ্য ওদের ভাবতে হয় না, ফুটপাতে শুয়ে থাকা সারি সারি মানুষের পাশে এক কোনে ওরাও ওদের জায়গা করে নেয়।

পরদিন সকালে লখাই নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়, ···দুখিয়া তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। আবার সেই কর্মব্যস্ততা। বাড়ী তৈরীর মশলা বানানোর যন্ত্রের একঘেয়ে ঘড়ঘড়ানি। ···গোর লাগি বাবু। ···বাবু আমি কুথায় কাম করব, ···বাবু হামি লখাই, কাল আপ হামাকে কামপে আসতে বুললে বাবু। কালকের তত্ত্বাবধানকারী বাবু এবার ধীরে ধীরে লখাইএর কাছে এগিয়ে আসে সঙ্গে আরো দুজন ষণ্ডামার্কা লোক। বাবু, হামি লখাই বাবু। ···কোন লখাই, কিধারকা লখাই···কি চাস তুই ইখানে, তত্ত্বাবধানকারীর গলার স্বরে রীতিমত অবিশ্বাসের সুর। ···বাবু হামি লখাই কাল আপ হামার থেকে বিশঠো রুপিয়া লিলে আপ হামকে কামনে আসতে বললেন। কাহেকো ঝুট বোলতা হ্যায়রে তত্ত্বাবধানকারী বাবু এবার লখাইকে মারতে উদ্যত হয় সঙ্গে ষণ্ডামার্কা লোক দুজনও তাদের লাঠি উঁচিয়ে ধরে। ···নেই বাবু হাম ঝুট বুলছে না, আপ কাল রুপিয়া বোলা থা কলসে কামনে আ যাও। এবার ষণ্ডামার্কা একজন লোকের লাঠি এসে পড়ে লখাইএর কাঁধে। ···আম্মা একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরোয় লখাইএর কাতরোক্তি কানে যেতেই রাস্তা পার করে দুখিয়া চলে আসে লখাইএর কাছে। সঙ্গে পোঁটলা দুটো ওখানেই থেকে যায়। ···কি হয়েছে রে লখা, ···ইরা তোকে মেরেছে। লখাইকে একপাশে বসিয়ে রেখে দুখিয়া চলে আসে একেবারে তত্ত্বধানকারীর সামনে। ···কুন মায়ের বেটা আছে দিকি, ···কুন মরদের বাচ্চা আছে দিকি মুর সামনে হামার লখার গায়ে হাত দিবে। দুখিয়ার চিৎকারে আশেপাশের কর্মরত লোকেরাও ছুটে আসে। দুখিয়া ততক্ষনে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, উ ···হারামখোর মুদের বিশঠো রুপিয়া তু লিয়ে ছিল তু হামার লখার গায়ে হাত দিছিস তুকে হামি ছাড়বক লাই। ক্রোধে অন্ধ দুখিয়ার সুতীব্র কণ্ঠস্বর যেন কিছুক্ষনের জন্য সমস্ত কিছুর গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। লখাই এবার ছুটে আসে দুখিয়াকে সামলাতে। ···চল আম্মা মুরা ইখান থিকে চলে যাই। দুখিয়া তখনও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে যাচ্ছে তুকে হামি ছাড়বক লাই, ·· তুকে হামি ছাড়বক লাই।

এইভাবে গত চারদিন ধরে কাজের সন্ধানে জোয়ারের স্রোতের মত ভাসতে থাকে দুখিয়া ও লখাই। সঙ্গের টাকা পয়সা যা ছিল তা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। হতাশা, ক্ষোভ ও ব্যর্থতায় ভেঙে পড়া লখাই কেবলমাত্র দুখিয়ার জোরেই এখনও আশা ছাড়েনি। দুখিয়াই সব সময় সান্ত্বনা দিতে থাকে। মা তো সে, মায়ের সব আশা তো ছেলেকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে।

সেদিন সকাল বেলায় তারা একই ভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। এ হাঁটা তাদের প্রথম দিনের হাঁটার মত নয়, এ যেন ক্লান্ত অবসন্ন দুটি' মানুষ তাদের দেহের বোঝা কোন রকমে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে। হঠাৎ ওদের চোখে পড়ে একটা বিরাট বাড়ীর সামনে তাদেরই মত অসংখ্য লোক চোখে মুখে যাদের বিগত কয়েক দিনের অনাহারের ছাপ সুস্পষ্ট সারি বেঁধে খেতে বসেছে। কতকগুলি লোক বিরাট বিরাট কতকগুলো পাত্র রাখা সেই খাবার শালপাতায় পরিবেশন করছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে যায় ওদিকে তারপর একধার দেখে দুজনে বসে পড়ে। দুখিয়া পাশে বসে থাকে এক বৃদ্ধাকে কৌতুহল চাপতে না পেরে বলে, ···উ···মা ইরা কি রোজই তুদের ইভাবে খানা দেয়। বৃদ্ধা দুখিয়ার দিকে চেয়ে প্রথমে কিছুটা অবাক হয় তার পর হতাশার সুরে বলে, তাহলে কি মুদের এ দশা হতো রে। তবে ইদের ঘরে কি খানা বেশী আছে যে ইরা তুদের খিলায়। ইদের যে ভগওয়ান আছে, ইদের ধর্মের যে ভাগওয়ান আছে সি ইদের বুলে গরীবকে খানা খিলাতে, তাইতো ইরা মুদের খিলায়, বৃদ্ধার সহজ, সরল মন দুখিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করে। তব্ ইদের ভগওয়ান বেকার আদমীর কামভি দিতে পারে, শুন লখা ইদের ভগওয়ান তুহারকে কাম দিবে, ইদের ভগওয়ান হামার লখাকে কাম দিবে, দুখিয়ার কথায় আবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে বৃদ্ধাটি। অবশেষে তাদের পাতেও এসে পড়ে পরিবেশিত অন্ন। খেয়ে দেয়ে তারা উঠে পড়ে, ধীর স্থির পদে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। আবার সেই চলা, দুধারের সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে যাওয়া। দুখিয়া আপন মনে বকে চলে ইদের ভগওয়ান হামার লখাকে কাম দিবে, ···ইদের ভগওয়ান হামার লখাকে কাম দিবে। ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে, অপমানে লখাইয়ের দুচোখ ফেটে জল আসে, কোনো রকমে সেটুকু চেপে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

বেশ কিছুক্ষন চলার পর হঠাৎ কিছুদূরে একটা পার্কের সামনে লোকের ভীড় নজরে আসে ওদের। একধারে স্থাপিত মঞ্চের উপর একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে আর তার সামনে বসে থাকা অসংখ্য লোক তা শুনছে। দেশের কোনো একটি রাজনৈতিক দলের হয়ত দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা চলছে। দুখিয়া ও লখাই আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় ভীড়ের দিকে। বক্তার কথাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ওদের কানে, ···"আমাদের আজ লড়াই করতে, বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, দেশের অগ্রগতি মেহনতী মানুষের হাতে হাত রেখে, তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের লড়াই করতে হবে। সমস্ত রকম লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে, আমাদের সংগ্রাম শোষণ ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, এ সংগ্রামের হাতিয়ার বন্দুক, পিস্তল নয়, এ সংগ্রামের হাতিয়ার জনগন। হঠাৎ দুখিয়া লখাইএর হাত ছাড়িয়ে ছিটকে একেবারে মঞ্চের সামনে চলে আসে, চিৎকার করে ওঠে দুখিয়ার কণ্ঠস্বর, ···আরে উ বাবু উপর থিকে বোলাতে কোন কাম হবেক লাই বাবু, তু মুদের কাছে লেমে আয়, দিখে যা মুদের উপর কুত অত্যাচার চলছে। দুখিয়ার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত, হতবাক বক্তা

ভদ্রলোকটি ধীর পদে নেমে ওর সামনে দাঁড়ায়। কি হয়েছে মা তোমার, কে তোমার ওপর অত্যাচার করেছে বল মা, আমরা সবাই তোর ছেলে, আমরা সবাই তাকে শাস্তি দেব, বক্তা ভদ্রলোকটি দুখিয়াকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। ···সব বলব, আগে তুরা বল যন্ত্রের সামনে হাত পা লা লেড়ে তুরা মুদের কাছে আসবি, মুদের দুঃখ তুরা বুঝার চেষ্টা করবি। বিগত কদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দুখিয়া একে একে সেই ভদ্রলোকটিকে বর্ণনা করল। সেই তত্ত্বধানকারীকে বাদ দিল না, সেই কুড়ি টাকার ঘটনাটাও না। বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে দুখিয়া, পাশে দাঁড়ানো লখাই যেন সমস্ত ঘটনার নীরব সাক্ষী। বক্তা ভদ্রলোকের গলা এবার গর্জে উঠল—বন্ধুগণ এই অত্যাচারের প্রতিবাদ আমরা করবই, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই একটা ঘটনার প্রতিকারেই হয়ত আমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তা নয় এ হবে আমাদের সংগ্রামের সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ। দেখতে দেখতে একটা বিরাট মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে যায় সর্বাগ্রে থাকে বক্তা ভদ্রলোকটি এবং দুখিয়া ও লখাই।

এই অগুনতি মেহনতী মানুষরাই এক দিন রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব, চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছিল। বিজ্ঞান প্রদত্ত যান্ত্রিক শক্তির থেকেও এই বিশ্বমানব-শক্তি অনেক বেশী শক্তিশালী।

একসময় তারা এসে পৌঁছোয় সেই জায়গায় যেখানে তাদের উপর অত্যাচারের সাক্ষ্য লখাই বহন করে বেড়াচ্ছে তার বাম কাঁধে। দূর থেকে এই বিশাল জনমানব স্রোত দেখে পালাবার চেষ্টা করেছিল সেই তত্ত্বাবধানকারী বাবু কিন্তু পারেনি। যে কর্মরত লোকেরা সেদিন দুখিয়ার বাথিত কণ্ঠস্বর শুনেও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি তারাই আজ সেই তত্ত্বাবধানকারী বাবুদের পালাতে দেয় নি। সহায়হীনতার যে আশঙ্কা তাদের সেদিন পিছনদিকে টেনে রেখেছিল অগুনতি মেহনতী মানুষের পদভারে তা আজ শতচূর্ণ হয়ে তাদেরকে সমস্ত রকম আশঙ্কার উর্দ্ধে তুলে নিয়ে গেছে!

শেষপর্যন্ত তত্ত্বাবধানকারী তার সমস্ত অপরাধ কবুল করে এবং লখাইএর দেওয়া সেই কুড়িটা টাকাও ফেরৎ দেয়। আনন্দে দুচোখ ছল ছল করে ওঠে দুখিয়ার। বক্তা ভদ্রলোক আসতে আসতে এগিয়ে আসে দুখিয়ার দিকে—দেখলে তো মা তোমার ছেলেরা সব সময় তোমার সঙ্গে আছে। তোমার লখাইও কাল থেকে এখানে কাজ করতে পারবে। হঠাৎ সুতীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে দুখিয়া, লা·····মুর লখা ইখানে কাম করবেক লাই। দুখিয়ার কথায় লখাইও চমকে ওঠে। ··মুরা ই

শহরে আর থাকবে লাই বাবু, মুরা মুদের গাঁয়ে যাবে বাবু, সি গাঁ সিখানে আমাদের সবকুছু আছে বাবু, মুরা মুদের গাঁয়ে যাবে বাবু, সি গাঁ সিখানে আমাদের সবকুছু আছে বাবু, মুরা সি গাঁয়ে ফিরি যিতি চাই বাবু। মুরা মুদের গাঁয়ে গিয়ে চাষ করবো বাবু, মুরা সোনার ফসল ফলাবো বাবু, উ মুদের মা আছে, উখানেই মুরা যাব বাবু, বলে আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে চলে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে।

শহরের এক দিনের জীবনযাত্রায়, কর্মকোলাহলের স্রোতে তারা যেন নিজেদের পুরোনো জীবনটাকে হারিয়ে ফেলেছিল। অবশেষে তারা বুঝতে পারে যে সেই আদি, অকৃত্রিম ধরিত্রীই তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। দূরে,.....দূরে, ...বহুদূরে, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় মা ও ছেলের শহরের বুকে আঁকা শেষ পদচিহ্ন। অস্তগামী সূর্যের করুনা মাখানো কিরণ যেন তাদের সর্বাঙ্গ ধুয়ে দিয়ে পবিত্রতার জগতে অনুপ্রবেশের পথ করে দিচ্ছে।

I have no doubt what soever that if those who have the education of the youth in their hands will but make up their minds, they will discover that mother tongue is as natural for development of the man's mind as mother's milk is for the development of infants body. ... I therefore regard it as a sin against the motherland to inflict upon her children a tongue other than the mother's for their mental develapment.

M. K. GANDHI

অপরাজেয়

প্রয়াস সরকার

দক্ষিণ কোলকাতার এই অঞ্চলটায় এখন লোড শেডিং। সন্ধ্যা হয়ে এলো। ঘন অন্ধকার এ সে গ্রাস করছে। চারিদিকের বাড়ীগুলোর জানালা দিয়ে ল্যাম্পোর বা হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছে। তাও যেন এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের কাছে একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টারই সামিল। ডিসেম্বর মাস। এই সন্ধ্যেবেলার-ই রাস্তাঘাট কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

ছবি তার ছোট্ট বারান্দাটায় বসে একমনে কত কি চিন্তা করে চলেছে। সামনে একটা ল্যাম্পো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। সে আলোয় তার মুখ ভালো করে দেখা যায় না। ছবির বয়স হয়েছে। এখন আর বেশী কাজ করতে পারে না। হাত কাঁপে। চোখের দৃষ্টিটাও ঘোলাটে হয়েছে। গায়ের চাদরটা শত ছিন্ন, তাতে শীত মানে না; তা আবার বয়সের চাপে গায়ের চামড়া লোল হয়েছে, রক্তের তেজ কমেছে। এই শীতে তার গায়ে যেন সূঁচ বিঁধছে। সে একটু জড়সর হয়ে ল্যাম্পোটার কাছ ঘেঁষে বসলো।

তার নিশ্বাস লেগে শিখাটা একটু কেঁপে উঠলো, আবার সোজা উপরের দিকে ধোঁয়ার শিস্ তুলে জ্বলতে লাগলো।

ছবির দুদিন কিছুই প্রায় খাওয়া হয়নি। হয়নি বললে ভুল হবে—বলা উচিত জোটেনি। তার কোটর প্রবিষ্ট চোখদুটো আর ঐ শুকনো ঠোঁট বোধ হয় তার ক্ষিদের কথাকে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে দিচ্ছে। এই শীতের জনহীন সন্ধ্যায় এই বৃদ্ধার ঘোলাটে দৃষ্টির সামনে কত কি ভেসে উঠতেলাগল। সে তার নিঃসঙ্গ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। দৃষ্টি অস্পষ্ট হলেও সে ছবি খুবই পরিষ্কার। ছবি দেখতে পাচ্ছিল এই সব তার জীবনের এক একটা ক্ষণ, কত শত দীর্ঘশ্বাসের বন্ধনে গাঁথা। দেবেশ জন্মাবার বছর দেড়েক পরে ছবি ওর স্বামীকে হারিছে। দেবেশকে সে কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছে। মেয়েটাকেও ভেবেছিল শেখাবে কিন্তু হলো না। মাধ্যমিক পাশ করার পর ওর আর পড়া হলো না। কিছু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ কিছুটা সংসারের চাপে।

ছেলেটাকে শত কষ্টের মধ্যেও কোন রকমে এতদুর চালিছে কিন্তু মেয়েটার বেলায় সেটা ঘটেনি। ও মেয়ে না!

ছবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে যত দিন আছে তত দিন মেয়ের গায়ে কেউ কুটোর আঁচড় দিতে পারবে না কিন্তু তার পর ?

মেয়েটাকে আরেকটু লেখাপড়া শেখালেই হয়তো ভালো হতো। অন্ততঃ নিজে যদি দু-পয়সা রোজগার করতে পারতো তবে ছবির এত চিন্তা থাকতো না।

এইতো দেবেশটাকে এতগুলো বছর কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছে ওই বা কি করেছে ? বি. এস. সি পাশ করে আজ কত বছর বসে রয়েছে আর মায়ের রক্ত চুষছে। আর ওই ঝন্টুর চায়ের দোকানটা হয়েছে কাল। সকাল সন্ধো একবার করে না গেলেই নয়।

আগে ছবি আর নমিতা দুজনে মিলে কিছু সেলাই-এর কাজ করে সংসারটা চালাচ্ছিল।

এখন ছবি আর পারে না। মেয়ের একার আয়েও চলতে চায় না। দেবেশকে কত বলে চাকরি-বাকরি না জোটে তো একটা টিউশানিও তো করতে পারিস্। দেবেশ বলে—হুঁঃ টিউশানি দেওয়ার জন্যে বসে আছে। আমরা নাকি লোফার ! চায়ের দোকানে লোফাররা বসে তাদের হাতে ছেলে-পিলে দিলে খারাপ হয়ে যাবে।

ওর বোনটা দিন দিন বড় হচ্ছে, দেবেশ কখনো ভাবে ওর বিয়ে দিতে হবে। বাবা নেই ওরই তো 'দায়িত্ব' ! যে এখনো বোনের রোজগারের পয়সা খেয়ে বেঁচে আছে তার আবার বোনের বিয়ে দেওয়া।

আগে দেবেশ মনে বড় বড় আদর্শবাদী চিন্তা পোষণ করতো। ছোট বেলা থেকে শুনে আসছে —'খারাপ কাজ করতে নেই, মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদই আসল সম্পদ, সৎপথে থাকা উচিত।' এরকম আরো কত কি !

সে মনে মনে ভাবতো জীবনে পরিশ্রম করবে, সৎ পথে থাকবে। কলেজ লাইফে সে ছাত্র-ইউনিয়ন-এর নেতা ছিল। রাস্তায় মিছিল নিয়ে বেরোতো শ্লোগান দিত, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অনাচারের প্রতিবাদ জানাতো। কিন্তু দিনে দিনে অভাবের তাড়নায় সব কেমন যেন ধুয়ে-মুছে-গলে গেছে। জীবন তার কাছে আজ শুধু প্রাণহীন, মাংসবিহীন একটা কঙ্কাল।

আজ আর তার আদর্শবাদী কথা শুনতে ভালো লাগে না, রাগ হয়। এইতো আজই দুপুর বেলায় মায়ের মুখের উপর বলে ছিল—রাখো তো তোমার ওসব মুখস্থ বুলি। ও শুনতে শুনতে কান পচে গেল। বাবা তো গেছিল আদর্শ দেখাতে, হস্পিটালের ভেজাল অসুধ ধরতে, কি লাভ হলো ? একটা সাধারণ ক্লার্ক হয়ে কি দরকার ছিল অত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাওয়ার ! লাশ ফেলে দিল। কি করতে পারলো আইন ? দেশের নেতারা ? দেশের আদর্শবাদীরা ? যারা ওসব আদর্শের কথা বলেছে তাদের তো আর পেটের জ্বালা ছিল না তাই ঐসব গল্প ফাঁদিয়েছে। আসলে ক্ষিদের জ্বালায় কথাগুলো একটা চাপা অভিমানের সঙ্গে দেবেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল। ও আগে খেয়াল করেনি

যে এই কথাটা মাকে কতখানি আঘাত দিতে পারে। খেয়াল থাকলে বলত না। সে জামাটা টেনে নিয়ে হাওয়াই চটিটা পায়ে ঢুকিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পর সারাটা দিন এদিক ওদিকে ঘুরে কাটিয়ে দিয়েছে। রাত্রে ঐ ঝন্টুর চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়েছিল। সারারাত শীতে খুব কষ্ট পেয়েছে কিন্তু বাড়ী ফেরেনি। ওর খুব অভিমান হয়েছে।

অভিমান? কার ওপর?

মার ওপর অভিমান?

না! তবে?

দেবেশ জানেনা তার মনের এই অভিমানটা এই যন্ত্রনাটা কিসের।

ওদিকে ছবি সারাটা রাত ছেলেটার কথা ভেবেছে। আগে দেবেশ রাগ করে বেরিয়ে গেলে সে নমিতাকে পাঠাত ডাকতে। এখন আর পাঠায় না। জানে পাঠালেও আসবে না, রাগ পড়ে গেলে ও নিজেই ফিরে আসবে।

আর নমিতা বলে ওর ঐ চায়ের দোকানটায় যেতে ভালো লাগে না। ও এখন বড় হয়েছে। সকাল বেলায় দেবেশের ঘুম ভেঙেছে। রাত্রে ঠাণ্ডায় ভালো করে ঘুম হয়নি। বোধ হয় সাতটা বাজে।

পেটে কিছু দানাপানি পড়েনি আজ তিনদিন হলো। ঝন্টু বলে দেখছি কিছু না খেয়ে পড়ে রয়েছিস্, একটা পাউরুটি অন্ততঃ খা।

দেবেশ বলে—ভালো লাগছে না। আর আমার খাওয়া হয়নি বলে তুই কি রোজ রোজ বিনাপয়সায় দোকানের লস্ করে আমায় খাওয়াবি।

এমন সময় গলির বাঁক ঘুরে 'তপতী দি' কে এ দিকেই আসতে দেখা গেল। বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়, মনে হয় স্কুলেই যাচ্ছে। স্বভাবটা বেশ মিষ্টি। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেবেশকে দেখে গিয়ে বললো—আচ্ছা তোরা কি বলতো? রাতদিন আড্ডা দিস্। সকাল হতেই এসে বসে গেছিস্! একটু কাজ-টাজের চেষ্টাও তো করতে পারিস্।

কথা দেবেশকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছিল কিন্তু দেবেশ কোন উত্তর দিল না তেমনি বেঞ্চটায় চুপ করে বসে রইল।

পাশ থেকে দিলু চায়ে কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা পাশে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললো—চাকরি কোথায় বলুন তো? কে দেবে চাকরি? তার উপর কম্পিউটার।

তপতী আর কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুললো। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো—ইস্! সাড়ে সাতটা; দেরী হয়ে গেল, যাই—বলে গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়াল।

তপতী চলে গেলে দেবেশ নিজের মনেই গজ্‌গজ্‌ করে বললো—মেয়েছেলেটা জ্ঞান দিয়ে গেল। যেখানেই যাও শুধু জ্ঞান আর জ্ঞান শোন। ধ্যাৎ—বলে সে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এমন সময় নমিতা এসে বললো—দাদা বাড়ী চল, মা ডেকেছে। আর—কিছু বোধ হয় খাস্‌নি? একটু ব্যবস্থা করেছি খাবি চল। —তুই বাড়ী যা—আমার কাজ আছে বলে সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই—হন্‌হন্‌ করে চলে গেল।

নমিতা পিছন থেকে ডাকলো—কোথায় যাচ্ছিস? কিন্তু উত্তর পেল না।

এ রাস্তার মোড়ে সত্যব্রত বাবুর বাড়ী। বাড়ীটা দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোকের পয়সা আছে। নাকি ব্যবসা করে। কিন্তু দেবেশ জানে সত্যবাবুর ব্যবসাটা কিসের। এ ব্যবসায় রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। দেবেশ পথ চলতে চলতে হঠাৎ সত্যবাবুর—বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। গেটের নেমপ্লেটে লেখা—

সত্যব্রত চৌধুরী
১৩ সি সন্তোষপুর এভিন্যু কলিকাতা-৭০০০৩২

দেবেশ নেমপ্লেটের উপর হাত রেখে নামটা ভেঙে উচ্চারণ করলো—সত্য-ব্রত। ছেলেবেলায় বাবা মা খুব ভেবে চিন্তে নামটা রেখেছিল বোধ হয়।

সে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। একটু ভিতর দিকে লাল রঙের মারুতি গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কলিং বেলটা টেপার আগে সে একবার ভাবলো—না! ফিরেই যাবে। তারপর কি ভেবে আবার বেলটা টিপলো। দরজা খুলে সত্যবাবু বেরিয়ে এলো। বললো—ও দেবেশ! কি ব্যাপার? —আমার আপনার সাথে কিছু কথা আছে। —তো বাইরে কেন? ভেতরে এসো—ওকে ভেতরে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সোফা দেখিয়ে দিলো। তারপর একটা সিগারেট মধ্যমা আর অনামিকার মধ্যে চেপে ধরে হাতটা মুঠো করে টানতে টানতে বললো—এবার বলো কি বলবে!

দেবেশের প্রথমটা শুরু করতে অসুবিধা হচ্ছিল। সে ভূমিকা করতে পারে না—বলেই ফেললো—খুব অসুবিধায় পড়ে আপনার কাছে কাছে এসেছি। বাড়ীর অবস্থাতো আপনি জানেন। এতদিন মা-বোনের খেয়ে কোন রকমে চলেছে। কিন্তু এখন মাও আর কাজ করতে পারে না সংসারটা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে।

সত্যবাবু বাকীটুকু বুঝে নিয়ে ওকে বাধা দিয়ে বললো—তা, কি আমার কাছে কাজের জন্যে এসেছো? কাজ কি এখন মুখের কথা? —না আমি জানি আপনি চেষ্টা করলেই একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

তুমারকে কাজ দিয়েছেন, আমারও একটা কিছু ব্যবস্থা না করে দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

—তা তুষার যে কাজ করে ও খুব কঠিন কাজ ও তুমি পারবে না।

তুষার কি কাজ করে তা দেবেশের ভালোভাবেই জানা ছিল। আর ভালো ভাবে জেনে শুনেই এখানে এসেছিল। সে খুব ব্যগ্র হয়ে বললো—আমি পারবো, আমি যে কোন রকম কাজ করতে পারবো। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সত্যব্রত কিছুক্ষন মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো—আচ্ছা তুমি এখন যাও ওবেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ মনুমেন্টের সামনে অপেক্ষা করো এরমধ্যে আমি তোমার ব্যাপারটা ভেবে দেখছি।

দেবেশ জানে তার মানে কাজ পাকা।

শীতের বেলা। ঘড়িতে তিনটে রোদটা পড়ে এসেছে। ছায়াও বেশ বড় হয়েছে। রোদটাও বেশ আরামদায়ক কিন্তু দেবেশের সে দিকে খেয়াল নেই। এক গভীর বিষন্নতায় মনটা ভরে আছে।

মনুমেন্ট টা কতদিনের সাক্ষী। তার মতো হয়তো আরো কেউ এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে। লড়ছিল নিজের সাথে। একটু দূরের মাঠটায় একদল ছেলে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছিল। দেবেশ ভাবলো ওরা কি সুখী। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভাবলো—আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা কি? বনের পশুরাও বুঝি সুখে আছে। গতরে ক্ষমতা থাকলে শিকার করে খাও। আমরা মুক্ত হলেও সহস্র অদৃশ্য শিকলে বাঁধা। এ শিকল অতি ভয়ঙ্কর। এ শিকল আমাদের শিক্ষা দেয় খেটে খাও; অথচ কাজ দেয় না, চুরি করা মহাপাপ; অথচ খেতে দেয় না। আমরা যুপকাষ্ঠে বাঁধা অজা মাত্র। ঐ চকচকে খড়্গটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ব্যা—ব্যা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমরা স্বাধীনতার খোলস পরে পরাধীনতাকে ঢাকতে চাইছি।

পাঞ্জাবী পরা লোকটা এদিকেই আসছে। কাছে আসতে দেবেশ জিজ্ঞাসা করলো-দাদা কটা বাজে? লোকটা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের পাঞ্জাবীর হাতটা একটু তুলে ঘড়ি দেখলো তারপর মোটা চশমার ভিতর দিয়ে দেবেশের দিকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। মুখে পান ছিল যথাসম্ভব সাবধানে বললো— পোনে টাট্টে।

তবুও তার সাদা পাঞ্জাবী আর কাঁধের শালটার দুএক জায়গায় একটু দাগ লাগলো। লোকটা কিন্তু ভ্রুক্ষেপও করলো না। চলে গেল।

একটু দূরে বাসষ্ট্যাণ্ডের গায়ে লাগা একটা ঘুঘনি পাউরুটির দোকান।
খাবারগুলো দেখে দেবেশের রসনায় রস এল না সব বোধ হয় শুকিয়ে গেছে।
দেবেশ ভাবছিল ফিরেই যাবে।
সত্যব্রতর আসার সময় হয়েছে। ঐ তো আসছে।

হঠাৎ একটা বাচ্চা ঐ দোকানটা থেকে একটা বড় মাপের রুটি নিয়ে দৌড় লাগাল। দোকানী ধর্-ধর্ মার-মার করে পিছনে তাড়া করেছে পালাতে গিয়ে বাচ্চাটা সত্যব্রতর গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। ততক্ষণে দোকানী সেখানে গিয়ে হাজির। গণ্ডগোল দেখে অনেক লোক জমেছে। দেবেশও গিয়ে দাঁড়াল ভিড়ের মধ্যে।

সবাই তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছে। এক কৌতূহলী ব্যক্তিকে সত্যব্রত বেশ লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছে—মশাই, দেশটা উচ্ছন্নে গেল। এই বয়স থেকে চুরি! বড় হয়ে খুন খারাপী করতেও বাদ রাখবে না। আমি ধরে ফেললাম বলে নইলে পালাতো।

এক মুহূর্তে রাগে দেবেশের মাথাটা ঘুরে গেল। মনে মনে বললো—শালা—সাধু যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা। দেশরক্ষা করছেন। ইচ্ছা করছিল তাকে একটা শিক্ষা দিতে কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সে সামলে নিলো।

আপন মনে চিন্তা করতে লাগলো—ও পথ আমার নয়। তোমরা পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে ভোগের সামগ্রী করে খেয়ে ছিব্ড়ে করে ফেলে দেবে। একটা দল তোমাদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করবে। আর আমরা পেটে বিদ্যা নিয়ে তোমাদের দলে ভিড়তে পারবো না, মুখ বুঁজে উচ্ছিষ্টও খেতে পারবো না। কেবল খালি পেটে শুকনো মুখে নীতি কথা, আদর্শের কথা, মানুষের মঙ্গলের কথা বলে যাবো।

তোমরা থাকবে 'সত্যব্রত' হয়ে আর আমরা তোমাদের পাপের গরল ধারণ করে নীলকণ্ঠ হতে চাইবো। প্রতিফলে চশমাধারী বাবুরা আমাদের দিকে একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবে।

চিন্তা করতে করতে সে অনেকটা চলে এসেছে। তার খেয়াল হলো পিছন থেকে সত্যব্রত থাকছে—দে-বে-এ-শ ও দে-বেশ। কিন্তু সে আর পিছনে ফিরে তাকালো না।

ভায়ালগ

অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত

সে বল্লে, "ঝেড়ে ফেলে দাও—"
আমি বলি, "কাকে ?"
"বুকের গভীরে বসা মৃতপ্রায় ওই মাছিটাকে,
মাছি ভন্, ভন্—আ মোলো—
বড্ড জ্বালায়—"
"কে বলেছে ওটা মাছি ?
আছি এত কাছাকাছি—
তা—ও চোখে ঘোর ?
ওটা তো আঁচড়,
লেগেছিল কবে কোন হিংস্র সে পশুর থাবায়—"
"তবে বুকটাই ছিঁড়ে খুঁড়ে ফ্যালো
কুৎসিত দাগটাকে সরাও, সরাও।"

এখানে থেকে যাও কিছুদিন

অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে তোমরাও এস এখানে। এখানে
নির্জনে।
শহরের থেকে দূরে এজায়গাটা কত ভাল!
পাহাড়ী গ্রাম, তিরতির ঝরণা,
সব থেকে ভাল, রাতের অন্ধকার,
আকাশ তখন বুকের মধ্যে
হাজার হীরে ফোটায়। আমিও দেখি
কয়লার ময়লা সরে জন্ম নিচ্ছে কোহীনুর
নীরব পারমানবিক রূপান্তর।
আমার মনের কপিল খনিতে তৈরী হচ্ছে পরিবেশ
দুধের মত সমলিন স্নিগ্ধ। একটু পরেই
জন্ম নেবে হীরের টুকরো কবিতা
আমার নেশার প্রোটিন, আয়ুর ভিটামিন।

"আজও প্রমিথিউস"

দীপশিখা রায়

সেদিন হঠাৎ তোমাকে দেখেছিলাম বাসের অপেক্ষায়,
ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অথচ বাড়ি-ফেরার তাড়নায়
উন্মুখ তোমার চোখদুটিতে ছিল না সেই দীপ্তি,
শরতের কাশ ফুলের মত তোমার চুলের এখানে ওখানে
সাদার ঝিলিক ; মাঠের মধ্যে পায়ে চলা পথের মত—
তোমার কোমরে সময়ের গভীর দাগ।
পড়ন্ত বেলার সূর্যালোকে--
এসবই আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছিলাম।

তোমার কি মনে পড়ে, গঙ্গার ধারে সেদিন
তুমি দেবী অ্যাথিনির মত গ্রীবা উঁচু করে বলেছিলে,
আমি তোমাকে
সেদিনও পড়ন্ত সূর্যের ছোঁয়া লেগেছিল তোমার চোখে,
গলায়, বুকে, কাঁচপোকা টিপে—
আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।
আমার চোখে কি ছিলনা সেদিন প্রমিথিউসের চতুরঙ্গ!
আজ তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে ছিন্নভিন্ন যকৃতের মত,
হলুদ হয়ে যাওয়া তুলোট কাগজের মত
নস্টালজিয়া ছাড়া পড়ে নেই কিছুই ॥

ওরা আসছে

কাল্লোল রায়

কফিন বাহকেরা শোন
কমরেডদের নিয়ে যাবে
পেরেকগুলো আস্তে মেরো,
ওদের যেন না লাগে।

কফিন বাহকেরা শোন
কমরেডদের নিয়ে যাচ্ছো
ধরা পড়তে পার, তবুও
সাবধানে যেও
ওদের যেন না লাগে।

কফিন বাহকেরা শোন
কমরেডদের নিয়ে লঙ মার্চে যাচ্ছো
লক্ষে তোমরা পৌঁছবেই
শুধু দেখ,
ওদের যেন না লাগে।

কফিন বাহকেরা শোন
কমরেডরা কফিনে নয়, আছে
শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুর,
গোড়ীবাড়ীতে, আছে
তোমার আমার হৃদয়ে
তাই চেষ্টা করো
ওদের যেন আর না লাগে।

চিরতরুণ হিমালয়

তপন পোদ্দার

[পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ শৃঙ্গমালা হিমালয়। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পর্কে নানান স্বাদের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গিয়েছেন। কোথাও বাসে কোথাও পায়ে হেঁটে এর সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন প্রায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। আবার এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করা থেকে শুরু করে নতুন নতুন শৃঙ্গ জয়ের নেশাতেও বহু মানুষ ছুটে চলেন হিমালয়ে ॥]

হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাগিদার পৃথিবী জোড়া মানুষ। সুবিশাল এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য দেশে ও বিদেশের মানুষ ছুটে আসেন হিমালয়ের কোলে। এর সৌন্দর্য্যের সঠিক রূপ ভাষা দিয়ে সব সময় বুঝিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। নয়নাভিরাম সেই সমস্ত দৃশ্য যারা একবার কিংবা দুবার অন্ততঃ উপলব্ধি করেছেন তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় তাকে অস্বীকার করা। কোন তুলনা করা যায় না। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বিশাল সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে দাড়িয়ে আছে শৃঙ্গরাজ। সুদূর কাশ্মীর থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত হিমালয়ের কত রূপ তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। আবার এরই মধ্যে বহু পাহাড়ী শহর গ্রাম গড়ে উঠেছে শত শত বছর ধরে। এরাও গড়ে তুলছে হিমালয়ের আরএক বৈচিত্রময় সৌন্দর্য্য। গভীর অমাবস্যার রাতে যদি হ্যালিকাপ্টার করে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় তাহলে মনে হবে সারা হিমালয় যেন দেওয়ালীর সাজে সেজে উঠেছে। যেন জোনাকিরা শৃঙ্গরাজকে পাহাড়া দিচ্ছে।

এই হিমালয়ে দৃশ্য দেখবার জন্য বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে চলেছে। কেউ যাচ্ছে যতদূর গাড়িতে যাওয়া যায় ততোদূর। আর অনেকে গ্রুপ করে চলেছে পায়ে হেটে অর্থাৎ Trek করে। একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা পুরো হিমালয়কে দেখার তবুও সবাই চেষ্টা করে যতটা বেশী সম্ভব স্বাদ আহোরন করার। সারা বিশ্বজুড়েই আছে Treking club। যারা বড় বড় বা নতুন কোন শৃঙ্গ জয় করে ফেরেন তারা স্বীকৃতি পান। যারা তা পারেন না তাদের স্বীকৃতি না থাকলেও চিরকাল স্বাক্ষী থাকেন হিমালয় যিনি কোনদিনই বেইমানী করেন না। যদিও এটা কোন ভানতত্ত্বের বিষয় নয় কারণ পাহাড় জয় করার মতো আনন্দ খুব কম জিনিসেই পাওয়া যায়। এর জন্য চাই সঠিক প্রশিক্ষণ যা একান্ত প্রয়োজন। শরীর চর্চা বিশেষ ভাবে দরকার তবুও মনের জোর ও সাহস থাকলে অনেকটা বেশী এগিয়ে থাকা যায়।

আমাদের দেশে এমন কোন সরকারী উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি যাতে করে দেশের যুব সমাজ Treking এর প্রতি বিশেষ ভাবে আর্কশিত হয়। ব্যক্তিগত বা মুষ্টিমেয় উদ্যোগেই গড়ে ওঠে ঐ সমস্ত Treking olub বা গোষ্ঠী। যুব সমাজের বয়সের ধর্ম হিসাবেই তার স্বভাব অনেকটা গড়ে ওঠে। তবে তার ফল সুদূর প্রসারী হতে পারে না যদি কোন সরকারী বিশেষ উদ্যোগ না থাকে। যুব সমাজের ধর্মই হচ্ছে অজানাকে জানতে চাওয়া, নতুন নতুন জয়কে ছিনিয়ে আনা। সমস্ত রকম সৃষ্টি বা ধ্বংসের কাজেই থাকে এই যুব সমাজ। খেলাধূলা থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা পর্য্যন্ত যুব সমাজের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে তাই প্রয়োজন Treking এর উপর বিশেষ কোর্স চালু করা। শুধুমাত্র T. V. তে বা পত্রিকাতে গল্প শোনালে চলবে না। প্রয়োজন Treking olub গুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয় চাই সরকারী উদ্যোগ, এটা বাণিজ্যিক নয় হওয়া উচিৎ বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রম। যেটুকু সরকারী উদ্যোগ আছে তা হচ্ছে সিন্ধুতে বিন্দু।

হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে আছে যা শুধুমাত্র Trek করেই যাওয়া সম্ভব। যেখানে দরকার দড়ি, গাইতি বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। বেশ কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যায় যেমন, গোমুখ, যমুনেত্রী, কেদার, বসুধারা, সানদাকফু বা ফালুট, পিণ্ডারী গ্লাসিয়ার, হর-কি-দুন, রূপকুণ্ড, হেমকুণ্ড, সুন্দর ডোঙ্গা, কাকনি, মণিমহেশ, তুঙ্গনাথ, অমরনাথ, ইত্যাদি। যেখানেই যাওয়া যাক না কেন তাতে হিমালয়ের নৈসর্গ সৌন্দর্য্য মনভোলানোর। সেই রকমেরই একটি হচ্ছে পিণ্ডারী গ্লাসিয়ার অর্থাৎ "O" পয়েন্ট।

হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলের মধ্যেদিয়ে যেতে হয় পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টে। অপূরূপ সৌন্দর্য্যের সম্ভার নিয়ে পর পর কয়েকটি তুষারাবৃত্ত পর্বতশৃঙ্গ দাড়িয়ে আছে। যাদের নাম ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, টেলপাস ইত্যাদি। এদের নয়নাভিরাম নৈসর্গ দৃশ্য দেখতে বছরে বেশ কয়েকটি গ্রুপ ছুটে আসে এই পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টে।

এই পিণ্ডারী যেতে হলে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বছরে মাত্র তিন মাস। মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর। কলকাতায় যখন প্রখর উত্তাপ চলে তখন এই পিণ্ডারীর হিমশীতল দেশে যেতে হয়। অনেকগুলি দ্রুতগামী ট্রেন যাছে লক্ষ্মৌ পর্য্যন্ত। সমতলের রুক্ষ রুঠ অথবা বিক্ষিপ্ত পাহাড় বা টিলা এবং কোথাও সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও সোনালী ধানের মরুপ্রান্ত দেখতে দেখতে যেতে হয়। সেখানে আবার ময়ুর ও সারসের এর বিচরণ পথের ক্লান্তি দূর করে। লক্ষ্মৌ পৌছতে আবার বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থানও চোখে পড়বে। লক্ষ্মৌ থেকে মিটার গেজ ট্রেনে করে আরো এগিয়ে যেতে হবে সারারাত্রি। কিন্তু যখন সোনালী সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে ততক্ষণে চিরতরুন হিমালয়ের পাদদেশে পৌছে যাওয়া।

হালদুয়ানী থেকে এবার বাসে করে হিমালয়ের বুক চিরে চলা। কত ধ্বস্ পড়া দৃশ্য, কত ছোট বড় পাহাড়ী শহর পেরিয়ে একেবারে পিণ্ডারীর দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে হচ্ছে। এই জায়গাটার ভারারী, এখানে আসতে অনেকগুলি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ভ্রমণবহুল স্থান অতিক্রম করতে হয়। কোথাও পাইন গাছ, কোথাও রোডাড্রেন, আবার কোথাও আমলকী, কোথাও আকরোট বাগান এর পাহাড়ী দৃশ্যের বিশেষ আর্কষন বৃদ্ধি করছে। পাখীদের অবিচল যাতায়াত, গ্রাম মানুষদের সাবলীল দৃষ্টিও মনে রাখার মতো। মাইলের পর মাইল নৈনিতাল আলুরক্ষেত বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করে।

এবার 'O' পয়েন্টের দিকে এগিয়ে চলা, গাইড, অথবা পোর্টারদের ব্যবহার অতি প্রিয়জনকেও হার মানায়। ধীরে ধীরে প্রথম দিন ষোল কিলোমিটার পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটা। বাংলার যাত্রীদের মুখে অবশ্য শুনতে পাওয়া যায় বিখ্যাত কয়েকটি গানের লাইন 'দুর্গম গিরি কানতার মরু দুস্তরও পারাবার'। চড়াই উৎরাই ডিঙ্গিয়ে কষ্টকে জয় করে প্রথম লোহারক্ষেতে। ভারী সুন্দর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গ্রামটি। ঠাণ্ডা মোটামুটি, উচ্চতা প্রায় ৬ হাজার ফুট। তবে অক্টোবর মাসে ঠাণ্ডা থাকে বেশী। প্রায় সবারই জীবনে প্রথম দেখা হয় এখানে আকরোট হয়ে আছে গাছে। কাঁচা অবস্থায় ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। সবুজ রঙ তারমধ্যে আবার সুন্দর মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে তোলে। গ্রামের মানুষ জনও সরল সাদা তাই তাদের সঙ্গে কথা চলে জানা যায় তাই দুঃসাহসিক জীবন যাত্রার কথা।

পরের দিন সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়ে আরো উপরের দিকে এগিয়ে চলা। বিশ্রাম নিতে ঢাকুরীতে দুপুরে। কিন্তু লোহারক্ষেত থেকে বেড়িয়ে প্রথম এগার কিলোমিটার রাস্তা প্রচণ্ড চড়াই ভাঙ্গতে হয়। কোথাও প্রায় ৪৫ ডিগ্রী খাড়াই পাহাড়ী রাস্তা। এতো কষ্ট করে ওঠার মুখে আবার একটি জনপ্রিয় একটি গানের লাইন মনে পড়ে যায়। 'পথের ক্লান্তি ভুলে, স্নেহভরা কোলে তুলে মা গো। ঐতিহাসিক এই রাস্তা পেরিয়ে যখন দশ হাজার ফুট উচ্চতায় ঢাকুরী পাসে বিশ্রাম অল্প সময়ের নিতে হয় তখন হিমালয়ের সারি সারি তুষার শৃঙ্গ গুলি পথে সমস্ত কষ্ট ও ক্লান্তিকে দূর করে দেয়। ঢাকুরী পাস হচ্ছে পিণ্ডারী যাওয়ার সর্ব উচ্চ শৃঙ্গ। এবার প্রায় খাড়াই নামতে হচ্ছে আরো দু কিলোমিটার রাস্তা। দুপুরে ঢাকুরীতে বিশ্রাম ও আহার সেরে নেওয়া। নিচ থেকে নিয়ে আসা চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের রান্না করা অথবা গাইডরাই তৈরী করে দেয়। এই ঢাকুরীতে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে হয়। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় হাত বাড়ালেই সমস্ত তুষার শৃঙ্গগুলিকে নিজের কোলে টেনে নেওয়া যায়। মেঘ আর রোদের খেলায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমার দেখা অনেক শ্রেষ্ঠত্বকে ছাড়িয়ে যায় এই ঢাকুরী। দার্জিলিং এর কাঞ্চনজংঘাও হার মানতে বাধ্য এই ঢাকুরীর কাছে। যে দৃশ্য দেখেছি তার পূর্ণাঙ্গ রূপ লিখে বলা সম্ভব নয়। যদি কোনদিন এখানে শহর বা ট্যুরিষ্ট অঞ্চল গড়ে ওঠে বা গড়ে তোলা যায় তাহলে এটা হবে

ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। পিণ্ডারীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ মনোলোভা দৃশ্য এই ঢাকুরীতে। এগারো কিলোমিটারের প্রচণ্ড ক্লান্তিকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ভুলিয়ে দেয়। এখান থেকে আরও সাত কিলোমিটার রাস্তা এগিয়ে হচ্ছে ভারতের শেষ গ্রাম খ্যাতি। এখানেই দ্বিতীয় দিন বিশ্রাম। রাস্তায় এখানকার গ্রামের শিশুরা সঙ্গি হয় অনেকটা পথ। তাদের হাতে চকলেট দিলেই সঙ্গি হয়ে যায় Treking Group এর সাথে। খ্যাতিতে আসার কিছু আগে আর একটা রাস্তা চলে গিয়েছে সুন্দরডোঙ্গা যাওয়ার। ঠাণ্ডা ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। কারণ পিণ্ডারী '0' পয়েন্ট এগিয়ে মে মাসে বৃষ্টি নিত্যসঙ্গী হয়, তবে পাহাড়ী রাস্তা দুপুর একটার পর থেকেই খারাপ হতে থাকে।

ভারতের শেষ গ্রাম ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা। আবার চড়াই উৎরাই পথ তখন মনে পড়ে 'পথ হোক বন্ধুর' গান। এখানে পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। প্রচণ্ড দুর্গম রাস্তা, তাই 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি' গাইতে গাইতে চলা। কষ্ট ক্রমশঃ কমে আসছে কারণ অভিজ্ঞতা বাড়ছে। গাইডের কোন অসুবিধা অবশ্যই হয় না, কিন্তু আমাদের মতো অনভ্যস্ত মানুষদের অবশ্যই অসুবিধা হয়, তবুও হিমালয়ের টানে বছরে বছরে চলে আসতে হয়। দেওলীতে বিশ্রাম নিয়ে আবার সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা খুবই চড়াই। এই চড়াই অবশ্য ঢাকুরী পাসের মতো নয়। ফুরকিয়াতে শেষ রাত্রিবাস করে সকাল সকাল পিণ্ডারী '0' পয়েন্ট অভিমুখে যাত্রা করা। এবার কয়েক কি.মি. রাস্তা চলার পরই শুরু হয়ে গেলো বরফ। এবার রাস্তা সেই শুধু শক্ত বরফের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পনে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া। সাত কি.মি. চলার পর শেষ এক কি.মি. রাস্তা অভাবনীয় খাড়াই। এক কি.মি. রাস্তা যেতে মনে হচ্ছে কয়েকশো কি.মি. রাস্তা। কিন্তু সমস্ত ক্লান্তিকে দূর করছে বরফের রাজ্য। এযেন অন্য এক পৃথিবীতে চলে এসেছি। শেষ এক কি.মি. রাস্তা পেরুতে মনে পড়ে আবার 'কতদূর আর কতদূর বলো মা' গানটি। অবশেষে সমস্ত কষ্ট দূর করে দেয় হিমশীতল পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার। এখানে অনবরত হুড়ম্ দাড়াম্ আওয়াজ হচ্ছে, অর্থাৎ কোথাও পাথর ভেঙ্গে পরছে কোথাও বরফ ভেঙ্গে পরছে। শিহরণ জাগানো দৃশ্য দেখে কোন মানুষই ফিরে আসতে চায় না। ঘন্টা খানেক বরফের রাজ্যে বিচরণ করে এবার অবশ্যই ফেরার পালা।

দেওলী থেকে আরও একটি গ্লেসিয়ার পয়েন্ট যাওয়া যায় নাম কাকনী। ১২ কি মি. রাস্তা মাঝে কোথাও থাকার জায়গা নেই তাই একদিনে ২৪ কি. মিটার রাস্তা Trek করতে হয়। অতি দুর্গম ও বন্ধুর পথ। তার উপর বুনো শুয়োর অথবা শ্বেত ভল্লুকের ভয় আছে। উপরে ওঠার সময় যেখানে রাত্রিবাস সেখানে নামবার সময় দুপুরে বিশ্রাম এবং এইভাবে পাঁচটি জায়গার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

এই রকমই অথবা আরো দুর্গম বেশ কয়েকটা Treking Stop আছে যেখানে বহু উৎসাহি

ও সাহসীরা প্রতি বছর যাচ্ছেন। তবে একটা কথা বলি যারা মুখে বলেন পিণ্ডারী হচ্ছে লেডিস ট্রেকিং তাদের সঙ্গে অবশ্যই একমত হতে পারছিনা।

ভারারী থেকে পিণ্ডারী হয়ে কাকনী এবং আবার ভারারীতে ফিরে আসতে মোট পাঁচটি জায়গা পরে। কাকনী থেকে দূরত্ব ১৬ কি.মি. লোহারক্ষেত। লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরীর দূরত্ব ১৩ কি.মি.। ঢাকুরী থেকে খ্যাতি দূরত্ব ৭ কি.মি.। খ্যাতি থেকে দেওয়ালী দূরত্ব ১৩ কি.মি, দেওলী থেকে কাকনীর দূরত্ব ১২ কি.মি.। দেওলী থেকে কুরুকিয়ার দূরত্ব ৬ কি.মি. এবং কুরুকিয়া থেকে পিণ্ডারী গ্লাসিয়ার ৯ কিলো মিটার।

উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু অঞ্চল আছে যেখানে বছরে কয়েকশো Treking Group যাচ্ছে প্রতিদিন। যদিও গোটা U. P. তেই ছড়িয়ে আছে পর্যটক অঞ্চল। কোথাও ইতিহাস তার স্মৃতি বিচরন করছে। কিন্তু উত্তর খণ্ডে আছে প্রতিদিনের নতুনত্বের আভা। হিমালয়ের একটি বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই আছে। বিশেষ করে তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গ গুলির। প্রতিটি অভিযাত্রী গ্রুপই সরকারী কোন সহযোগীতা পেয়ে থাকেন এমন নয়। সব গ্রুপই সরকার স্বীকৃত তাও নয়, তবু ছুটে চলে তারা।

এমনই বেশ কয়েকটি গ্রুপের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, তাদের গ্রুপের মনবল যথেষ্ট আছে কিন্তু নেই কোন সাজসরঞ্জাম। যা নিতান্তই প্রয়োজন। আমাদের দেশের মধ্যে কয়েকটি Mountenary শাখা আছে যা দিল্লী থেকে পরিচালিত হয়। তাদের স্বীকৃতি পাওয়া সত্যই দুঃস্কর ব্যাপার।

পিণ্ডারীতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম দিল্লীর স্কুল গুলি থেকে আসা ছাত্রদের একটি গ্রুপ। সেখানকার স্কুলগুলি সঙ্গে মাউন্টেনারী ইনষ্টিটিউট গুলির সম্পর্ক আছে। যারা প্রতি বছর স্কুল ছাত্রদের এই রকম Treking এর ব্যবস্থা করে থাকেন। চৌদ্দ বছর বয়সের ছাত্রকেও তারা পাঠান। তার জন্য সমস্ত টাকা পয়সা ও সাজসরঞ্জামের দয়িত্ব নেয় সরকার। Treking করতে তাই ওরা বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত থাকে। সারা দেশে যত Treking Group যায় বিভন্ন প্রান্তে তাতে সত্যি কথা বলতে কি—যে সেখানে বাংলার ছেলেরা সংখ্যায় খুবই নগন্য।

৪১ বছরের স্বাধীন দেশে আজও যুব সমাজ অবহেলিত। এদের জন্য নেই সুখাদ্য, নেই সুশিক্ষা, নেই চাকরী, নেই কোন খেলাধূলার উপযুক্ত পরিবেশ। তাই আমার দেশের সুস্থ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের পাশে প্রগতিশীল সরকার বা মানুষজনকে এগিয়ে আসতেই হবে। কারণ এই সমস্ত অঙ্কুর গুলিকে যদি সঠিক ভাবে লালন পালন করা যায় তাহলে অবশ্যই এই সমস্ত জয়ের মধ্যে দিয়েও যুব সমাজের মধ্যে নতুন জয়ের আশাকে উজ্জিবিত করা যায়। আমার দেশটাকে সব পাওয়ার দেশে পরিণত করার কাজে এরা অবশ্যই এগিয়ে থাকবে।

সোভিয়েত দেশে নবীকরণের বিপ্লব

অরিন্দম বন্দোপাধ্যায়

১৯১৭ থেকে ১৯৮৮ সাল, পার হয়ে গেছে সাত সাতটি দশক। সেদিনের সেই শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র আজ উপনীত হয়েছে এক উন্নত এবং পরিণত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এই ক্রমবিকাশের ধারায় সোভিয়েত দেশকে বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন ভাবে বহু আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সব বাধা সে অতিক্রমও করেছে সাফল্যের সঙ্গে।

সোভিয়েতে প্রথম সাংস্কৃতিক বিপ্লব :—

একটু ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সকল বাধা বিপত্তির সূচনা হয়েছিলো সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই। বৈদেশিক পুঁজিবাদী শক্তিগুলি যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিনের সেই সদ্যসৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্যে তাদের প্রচেষ্টাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছিলেন সেভিয়েত জনগণ, লেনিনের নেতৃত্বে। আর তৎকালীন আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার প্রয়োজনে সেই ১৯১৭ সালেই সোভিয়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লব—যার মূল নীতি ছিল সর্বস্তরে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা' এবং উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে এক আর্দশ সমাজতান্ত্রিক মানুষে পরিণত করে তোলা।

বর্তমানে দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা :—

দীর্ঘ ৭০ বছরের সোভিয়েত সমাজের এই ক্রমবিকশের ইতিহাসে বহুবার নেতৃত্বের রদবদল ঘটেছে। লেনিনের পরেই যে ব্যাক্তিত্বটির কথা আমাদের মনে আসে তিনি হলেন কমরেড জোসেফ স্তালিন। তার নেতৃত্বেই প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলো সঠিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯—১৯৪৫) সময় হিটলারের অত্যাচারী নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত "লাল ফৌজ" এর কাছে পরাজিত হয়। ইতিহাসে যার এক অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। সেদিন "লাল ফৌজ" যদি নাৎসীদের দমন করতে ব্যর্থ হতো তবে আজ হয়তো গোটা পৃথিবীর ইতিহাসটাই অন্যভাবে লিখতে হতো। স্তালিনের পর নিকিতা ক্রুশ্চেভ ক্ষমতায় এসে স্তালিনের আমলের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে "সংশোধনবাদ" ও "ব্যাক্তিসাতন্ত্রবাদ" কে আঁকড়ে

ধরলেন। ক্রুশ্চভের পর এলেন ব্রেজনেভ, তিনি "ধীরে চলো" এবং "আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার" নীতিকে অনুসরণ করলেন যার ফলে শ্লথ হয়ে গেল সমাজতন্ত্রের পুনর্গঠন, প্রাধান্য পেল ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র-বাদ। তাঁর মৃত্যুর পর আরও দু-একবার নেতৃত্বের রদবদল হল এবং অবশেষে বর্তমানে দৃঢ়ভাবে দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিল মিখাইল গরবাচেভ। নেতৃত্বে এসেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে তার মূল কর্তব্য হবে দেশের পুণর্গঠন বা পেরেস্ত্রইকা (অবশ্য সমাজতন্ত্রেরই পুণর্গঠন) আর এজন্য তিনি সূচনা করেছেন তার দেশের দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল নীতি কিন্তু সেই ১৯১৭ সালে মহান লেনিনের অনুসৃত "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা"-র নীতি যদিও গরবাচেভ্ এর সঙ্গে যোগ করেছেন আরও একটি কথা "গ্লাসনস্ত" বা খোলামেলা পরিবেশ। সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক এবং বিশেষ ভাবে অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এই নবীকরণের বিপ্লব তুলেছে সমালোচনার ঢেউ— যার তরঙ্গাঘাত এসে পড়েছে আমাদের দেশের বুকেও—শব্দের কি মহিমা!

পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত :—

১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে এই বৈপ্লবিক ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল। দুটি নতুন শব্দ ভেসে এসেছিল রাশিয়া থেকে সারা বিশ্বে— পেরেস্ত্রইকা এবং গ্লাসনস্ত। তারপর থেকে এখনও পর্য্যন্ত সেভিয়েত দেশের তাজা খবর বলতে ঐ দুটি শব্দ। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রকাঠামোয় তাদের প্রভাব হবে সুদূর প্রসারী একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। খুব সহজ কথায় বললে বলতে হয় 'পেরেস্ত্রইকা' কথাটির অর্থ পুণর্গঠন এবং গ্লাসনস্তের অর্থ 'খোলামেলা মনোভাব'। এই দুইটি শব্দের একই সাথে ব্যবহার করার অর্থ কি? অর্থটি বুঝতে গেলে আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে। পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোন ম্যাজিক নয়। বিপ্লব হল আর সব মানুষের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল, সব শ্রেণীর মানুষ বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকেই সমানভাবে সমাজতন্ত্রের সুফল ভোগ করতে লাগলো, সব শ্রেণীবিন্যাস চিরতরে ঘুচে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই! এই সব ধারণা অবাস্তব এবং অলীক কল্পনা। আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক কার্বন পরীক্ষা— কার্বন এই অর্থে, যে এখানে পরীক্ষার উপাদান বা উপকরণ হল এই বিশ্বজগতের সবচেয়ে উন্নত জীব, মনুষ্য সম্প্রদায়কে নিয়ে, তার সমাজকে নিয়ে। অতএব বিপ্লব একবার সংগঠিত হয়ে যাবার পর তার সমস্ত রকমের সুফল পেতে সময়ও লাগে প্রচুর। তবে এই সমস্ত আপাত বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপগুলি কিন্তু একই মহান বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং কিছু সময়ের ব্যবধানে তারই নেতৃত্বে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—এই দুটোই প্রকৃত পক্ষে আলাদা কোন ঘটনা নয়। তাই যখন ১৯৮৫ সালে গরবাচভ দ্বিতীয়বারের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে এক সাংস্কৃতিক

বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন তখন আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। গরবাচভে আহুত এবং বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত ঐ বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হল পেরেস্ত্রৈকা অর্থাৎ পুণর্গঠন, সমাজতন্ত্রের পুণর্গঠন। আর এই সমাজতান্ত্রিক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মূল নীতি বা ভিত্তিটি হলো গ্লাসনস্ত বা খোলামেলা মনোভাবের নীতিও পুনর্গঠন বা পেরেস্ত্রৈকাকে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। অর্থাৎ এখন থেকে সোভিয়েত সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ, সমস্ত শ্রেণীর মানুষ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে সকলেই খোলামেলা ভাবে তাদের নিজের, অপরের রাষ্ট্রের এমনকি পার্টিরও কর্মসূচী নিয়ে নির্দ্বিধায় মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করতে পারবেন এবং এইভাবে তারা সকলেই তাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতিকেই তরান্বিত করবেন।

কিন্তু স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসতেই পারে এই গ্লাসনস্ত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তা হল ৭০ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং খোলামেলা মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গরবাচেভ এতটা ভাবিত হলেন কেন।

এই প্রশ্নের সরাসরি বা সঠিক উত্তর হয়ত এই মুহূর্তে আমরা দিতে পারব না. তবে এইটুকু বলা যেতে পারে, যে কোন দেশই, সমাজতান্ত্রিক অথবা ধনতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক যাই হোক না কেন জনগন যদি তাদের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে প্রচণ্ডভাবে সচেতন না হন তবে শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে কিছু এসে যায় না। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সংবিধানের গোড়া থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কিছু কিছু অভূতপূর্ব অধিকার রয়েছে তার মধ্যে একটি হল মতপ্রকাশের অধিকার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই অধিকার সাধারণ মানুষকে সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তৎসহ স্মরণ করা যেতে পারে যে, ব্রেজনেভের আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা ইত্যাদি রক্ষা করতে সংবিধানে ব্যক্তিমানুষের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি, সেগুলো শুধু কতকগুলো নিয়ম হিসেবেই সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে তার বিকাশলাভ ঘটেনি তৎকালীন সোভিয়েত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ক্ষুধা অত তীব্র হচ্ছিল না বলে। এখন সময়ের অমোঘ নিয়মে সমগ্র সোভিয়েত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি আশা আকাঙ্খা বেশ তীব্র, রাজনৈতিক সচেতনতাও হয়েছে বর্দ্ধিত। তাই সঠিক সময়েই এক সার্বিক পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছেন গরবাচেভ ঘোষণা করেছেন তাঁর উদ্ভাবিত গ্লাসনস্ত নীতির।

দেশব্যাপী এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এক সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রভাব বা ফল খুব সুস্পষ্ট।

অর্থনৈতিক পুণর্গঠন :—

পেরেস্ত্রৈকার উদ্দেশ্যানুসারে সোভিয়েত রাষ্ট্র এক ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে, কেননা, সে দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে অর্থনীতির পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু ভুল ত্রুটি থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বা স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে তাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না অর্থাৎ মার্কসবাদী সংজ্ঞানুসারে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব ফাঁকগুলো ছিল তাদের সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে ব্যক্তিগত বা বস্তুগত উৎসাহদানের উপর যতটা ভরসা করা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ততটা উৎসাহদান হচ্ছে না আর ঠিক এখানেই যেন একটা ভুল করতে চলেছে সোভিয়েত দেশ এবং সে দেশের কমুউনিষ্ট পার্টি। বস্তুগত ও ব্যক্তিগত উৎসাহদানের নীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী এবং এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি শুধু যে তাদের দেশের ৭০ বছরের অনুসৃত সমাজ-তন্ত্রের ইতিহাসেই কালিমা লেপন করবে তাই নয়, এর ফলে গোটা যৌথ সেভিয়েত ব্যবস্থাই এক বিরাট ধাক্কা খাবে। ওঁরা যদি বলতেন যে, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধির অভাবেই রাষ্ট্রীয় খামার বা যৌথ খামারে ভাল কাজ হচ্ছে না, তাহলে বলার কিছু ছিল না।

উৎপাদন তীব্র মাত্রায় বাড়াতে সাময়িকভাবে তারা রাষ্ট্রীয় খামার থেকে সমবায়ের দিকে যাচ্ছেন। একথাও বললেও তাদের বলার কিছু ছিল না—কেননা সদা পরিবর্তনশীল ও পরিবর্ধনশীল এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের এগিয়ে যাবার পথে উৎপাদনের হার দ্রুত করার জন্য মাঝেমধ্যে এই পশ্চাৎ পদক্ষেপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সোভিয়েত নেতারা বলছেন যে, আমলাতান্ত্রিকতার জন্যই রাষ্ট্রীয় খামারে কাজ হচ্ছে না। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তারা সঠিক নীতিটি গ্রহণ করবেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপান্তরের পর্যায়ে শুধু বস্তুগত উৎসাহদানই যথেষ্ট নয়। বেশী করে প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক চেতনাবৃদ্ধির। অর্থাৎ রূপান্তরের পর্যায়ে বস্তুগত উৎসাহদানের প্রচেষ্টা হবে ক্রমহ্রাসমান এবং বিপ্লবী মতবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাবোধ হবে ক্রমবর্ধমান। একদা এই রূপান্তরের পর্যায়ে শুধু মাত্র বিপ্লবী মতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়ায় চীনের কমুউনিষ্ট পার্টিকে বর্তমানে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আর বর্তমানে সোভিয়েত দেশে ঐ একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে শুধু বস্তুগত উৎসাহদানের নীতি অপসরন করার ফলে। ফলে মাওসেদং ও গরবাচেভের নীতি দুটি দুদিকের দুই চরম বিচ্যুতি। মাওয়ের ক্ষেত্রে চরম বামপন্থী, গরবাচেভের ক্ষেত্রে চরম দক্ষিণপন্থী।

ইতিহাসের পুর্ণমুল্যায়ন :—

সেভিয়েত ইউনিয়নের কমুউনিষ্ট পার্টি বর্তমানে তাদের দেশের ইতিহাস এবং বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের গরবাচেভ পূর্ব নেতাদের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন যা এক খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক

ঘটনা। কিন্তু আমাদের উৎসাহ তখনই লুপ্ত হয় যখন আমরা দেখি যে, নেতৃবর্গের এই সমালোচনা প্রায় অনেকটাই একপেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষতঃ একজনের ক্ষেত্রে তো বটেই এবং বলা বাহুল্য তিনি হলেন মহান সোভিয়েত নেতা, জোসেফ স্তালিন। খোলাখুলি আলোচনায় এমন একটি ধারনার সৃষ্টি করা হচ্ছে যেন স্তালিনের আমলে সব ক্রিয়াকলাপই ছিল ভুল। স্তালিন যে দেশকে তার সুষ্ঠু পরিচালনা দ্বারা ফ্যাসিষ্ট হিট্‌লারের নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন তা মনে রাখা হচ্ছে না। কৃষি খামারগুলিকে যৌথ পদ্ধতিতে নিয়ে গিয়েও যেন তিনি ভুল করেছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণে এক প্রয়াসে যে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেটাও কি স্তালিনের ভুল? এটা এখন আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিস্কার যে, সাধারণভাবে সোভিয়েত দেশে অতীতের অনৈতিহাসিক পর্যালোচনা চলছে।

ধর্ম :—

গ্লাসনস্ত নীতির কল্যাণে এখন ধর্ম নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে সোভিয়েত দেশে। সদ্য বিপ্লবোত্তর রাশিয়া!—সেই সময়কার একটি ঘটনা বলছি; জানা গেল যে ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেণ বাইবেল সোসাইটি মস্কো শহর থেকে তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে এসেছে এবং তার কারণ হিসেবে তারা এই মন্তব্য করেছিল "Russia is a country where there is no 'God' but Karl Marx and Lenin is his prophet." এটা অবশ্যই জনৈক পশ্চিমী দেশের এক ধার্মিক নাগরিকের তৎকালীন পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশটির বিরুদ্ধে এক বিকৃত মন্তব্য তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই মন্তব্যটির অভ্যন্তরে বেশ খানিকটা সত্যও লুকিয়ে রয়েছে। সত্যটি হল সেদিনের সোভিয়েত দেশের আপামর জনসাধারণ ধর্মের উন্মাদনাকে কাটিয়ে, ধর্মের ভাববাদী দর্শনকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কার্ল মার্কস প্রণীত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দর্শণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে এক সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন, মহান লেনিনের নেতৃত্বে। কঠোর বস্তুবাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাববাদের কোন আপোস করা যায় কিনা বা আদৌ হয় কিনা এটুকু ভাববার মত সময়ও তাদের হাতে ছিল না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার সংরক্ষনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রথম থেকেই ছিল, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশে। তত্ত্বগতভাবে লেনিন অবশ্যই এটা জানতেন যে এই দুই পরস্পর বিরোধী দর্শণের কখনই মিল হতে পারে না, ভবিষ্যতেও হবে না। তবুও সেদিন কেন বিপ্লবের শুরুতেই ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হল না? সেটা হ'ত নির্বুদ্ধিতা, এটুকু গোঁড়ামির ফলে হয়ত জনগন বিদ্রোহ হয়ে উঠত এবং আখেরে মূল লক্ষ্য বিপ্লবই যেত ভেঙ্গে। তবে তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব এই ধারণাই পোষণ করতেন যে সময়ের সাথে তাল রেখেই সোভিয়েত জনগণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতি আরও গভীরভাবে বুঝবেন এবং গ্রহণ ক'রবেন এবং এরই সাথে সাথে ধর্মীয় ভাববাদ সম্বন্ধে হ'য়ে পড়বেন নিস্পৃহ। কিন্তু শেষাবধি

কি হল সোভিয়েত দেশে ? জনগণ সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হ'য়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন, তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই যে, ধর্মের মোহ সোভিয়েত জনগণের কাটেনি বরং বেড়েছে অথবা বলা যেতে পারে এতদিন যা সুপ্ত ছিল বর্তমান ''খোলা হাওয়ার'' নীতিতে তা হয়েছে প্রস্ফুটিত যার প্রভাবে ইস্কনের মত এক সাম্প্রদায়িক সমাজবাদী আমেরিকার আর্থিক মদতে পুষ্ট এবং ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান আজ সোভিয়েত দেশে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে, যার প্রভাবে কলকাতার রাস্তায় রথের রশিতে টান মেরেছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত। এই একটি দিক থেকেই গরবাচেভের নীতি বোধ হয় বুমেরাং হ'য়েই তার কাছে ফিরে আসতে পারে কারণ ধর্মের অধিকারের সূত্র ধরেই জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ যার টাটকা প্রমাণ সোভিয়েত আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার কয়েকটি জায়গায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষাবলী, আজকে ক্ষুদ্র আকারে থাকলেও ভবিষ্যতে যে তা বৃহদাকার ধারণ ক'রবে না কেই বা তা বলতে পারে? এবং যদি ঘটে তবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে গরবাচেভকেই।

ধর্মীয় উন্মাদনার বিষময় ফল সম্পর্কে গরবাচেভ যদি এখনই সতর্ক না হন তবে তিনি তো তার নিজের দেশের সংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যার্থ হবেনই তৎসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলি যাদের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের সম্পর্ক বিশেষ ভাল, যেমন আমাদের দেশ, সেইসব দেশে নতুন করে মৌলবাদের মাথা চাড়া দেবার পেছনে থেকে যাবে তাঁর পরোক্ষ দায়িত্ব কারণ অশিক্ষার ভার ঐসব দেশে তাঁর দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এইসব দেশগুলির রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ কাঠামোও তার দেশের তুলনায় ভিন্ন আমাদের তাই বিশ্বাস যে, অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে গরবাচেভ সতর্ক হবেন তাঁর ঐ 'খোলামেলা' নীতির প্রয়োগে, কেননা তিনি আর যাই করুন না কেন, ধর্মীয় প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুবিশাল আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রতে পারবেন না।

"যখন একসঙ্গে হাত মুঠো করে দাঁড়াতে পারলেই আমরা
সব কিছু পাই—
তখন বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মানুষ

সুবীর ভট্টাচার্য

কবি চণ্ডীদাস বলেছিলেন—

"সবার উপরে মানুষ, সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—সার কথা। পৃথিবীতে মানুষই সত্য! মনুষ্যত্ব-ই সত্য। মানুষের ওপরে কিছু নেই, কেউ নেই! মানুষ-ই সব! কিন্তু, একটা প্রশ্ন থেকে যায়। 'মানুষ' কে? তার সঠিক সংজ্ঞা কি? কবি চণ্ডীদাস কোন সূত্রে ঘোষণা করেছেন সবার উপরে মানুষ? মানুষকে কবি কোন দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করতে চেয়েছেন? এই সমস্যার সমাধান করতে হলে একটু গভীরে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যাক।

আমরা বলি, সেই মানুষ। যার দেহে মনে একটা মানবিক অনুভূতি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়া করে চলেছে। তাকে যদি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে তার মানবিক ক্রিয়া গুলিই আগে চোখে পড়ে। কিন্তু মানবিক অনুভূতি তো আছে বুঝলাম! কিন্তু তা কিভাবে আছে? অর্থাৎ, তার স্বরূপ আমরা কিভাবে বুঝবো? সংক্ষেপে এটাকে মনুষ্যত্বের জীবের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বলতে হয় মানবিক অনুভূতি হলো মানুষের সাধারণ গুন (যা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বা Natural)

কিন্তু বাস্তব বিশ্লেষণটা অবশ্য অন্য। মানবিক ব্যাপারটা হলো একটা সত্ত্বা। এটাকে আমরা বলতে পারি মানবিক সচেতনতা। এই সচেতনতা মানব মনের সাধারণ গুন। এর বিকাশেই 'মানুষ' সমাজের—তথা, জগতের শ্রেষ্ঠতর জীব।

মানুষ নামের আর একটি তাৎপর্য্য আছে তাহলো—মান এবং হুঁশ। (সচেতনতা) এই দুই-এর মিলনই মানুষ। অর্থাৎ যার মান এবং হুঁশ আছে তাকেই মানুষ বলে। হুঁশ মানে সচেতনতা বা spirit এই spirit-মনোভাব বা আত্মিক সচেতন তাই মানব মনে অহরহ খেলা করে। মানুষ মানে দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা, কয়েকটা অঙ্গ প্রতঙ্গ বোধ্য ভাষায় কথা বলা। সামান্য পার্থিব জীব নয়। আমরা মানুষকে অন্যভাবে মর্যাদা দিই। মানুষের সচেতনতাই তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে স্নেহ, দয়া, মায়া প্রীতি প্রেম-ভালোবাসা। মানুষের এটাই স্বাভাবিক প্রকৃতি। মনে রাখতে হবে গোটা পৃথিবীটাই চলছে স্নেহ, দয়া, মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে—যার মূল বাহক মানুষ মানুষের এই স্বাভাবিক গুনই বিশ্বের দরবারে 'মানুষ' হিসাবে পরিচয় দেয় তাই আমরা বলবো—মানুষ হলো সেই সত্ত্বা—যার আত্মিক সচেতনতা থাকবে। যার বিবেক, মায়া, প্রীতি মহত্ব এবং স্নেহ ভালোবাসা থাকবে। এই কটা গুনের অধিকারী যে নয়—সে নির্দয় বলে পরিচিত। কবি চণ্ডীদাস তাই বলেছিলেন যে, মানুষ সেই কারণেই বড় কারণ বিবেক, বুদ্ধি, মহত্ব ইত্যাদি আছে। এই ক্ষেত্রে মানুষ সব প্রাণীর উপরে—অর্থাৎ মানুষ সত্য শিব এবং সুন্দর।

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ—১৯৮৭-৮৮

সভাপতি
অধ্যাপক অশোক রায়

সহ সভাপতি
ধ্রুবজ্যোতি মিত্র

ক্রীড়া সম্পাদক
মানস মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক
রণজিৎ রায়
অঞ্জন মজুমদার
প্রান্তিক মুখোপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক সম্পাদক
দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত

সহ সম্পাদক
চিত্রক মজুমদার
প্রবাল সেনগুপ্ত
প্রতিম ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক
অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সহ সাধারণ সম্পাদক
অর্জুন রায়
শান্তনু নন্দ

পত্রিকা সম্পাদক
বিশ্বরূপ ধরচৌধুরী

সহ সম্পাদক
সোমনাথ ঘোষ
কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

ক্যান্টিন সম্পাদক
সুধীর মেনন

সহ সম্পাদক
কল্লোল ঘোষাল
রাজীব কুমার বিশ্বাস

কমনরুম সম্পাদক
অভিজিৎ দত্ত

সহ সম্পাদক
অনির্বান রায়
চঞ্চল মুখোপাধ্যায়
চিরঞ্জীব কুমার দে

ছাত্রাবাস সম্পাদক
সরজিৎ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক
অপু দাস

ছাত্রী কমনরুম সম্পাদিকা
নন্দিনী ঘোষ

গ্রন্থাগার সম্পাদক
দিলীপ সামুই

সহ সম্পাদক
শেখ শাহাজাদা
সুমন ঘোষ

সংসদ বার্তা

সভাপতি

অধ্যাপক আশোক রায়

সমস্যাসঙ্কুল ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও আশুতোষ কলেজের মুখপত্র তার অতীত ঐতিহ্য বহন করে সঠিক সময়েই আত্মপ্রকাশ করল। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন প্রাণের উচ্ছল জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপক্কতায় সাহিত্য-সংস্কৃতির এই মুখপত্র নিশ্চয়ই নিজ ঐতিহ্যে মহিমান্বিত হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করবে।

বিশ্বযুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের পরিপন্থী। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায় ঐকান্তিক প্রয়াসে এই কলেজের ছাত্র সংসদের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। ১লা সেপ্টেম্বর কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছে —"ভাঙবে, ভাঙবে রুদ্ধ কারা, শাসকের শৃংখল চূর্ণ করবই—নেলসন মেণ্ডেলা"। দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ব্যাপক সাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিকতাবোধ ও দরদী মনের পরিচয় দেয়।

অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠা ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যতম ব্রত সেই ব্রতে ব্রতী হয়ে ছাত্র-সংসদের বিভিন্ন শ্রেণী-প্রতিনিধিরা তাদের সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে চলেছে, ফলে কলেজের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপ্তি ঘটেছে। ছাত্র-সংসদ পরিচালিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক হারে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। খেলাধুলার ক্ষেত্রে একের পর এক সাফল্য সংসদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্যতম পরিচায়ক। সংসদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল, আমাদের স্বপ্ন কলেজের নতুন গ্রন্থাগার ভবন, আজ বাস্তব।

অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-সংসদ ও পরিচালন সমিতির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনমূলক সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের অন্যতম ফসল বহুদিনের বহু আকাঙ্খিত কলেজের নতুন ভবনের বাস্তবায়ন।

আশা করব, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের, সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ বজায় রাখতে ও তার মনোন্নয়ন ঘটাতে লাগাতার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই সঙ্গে আরো আশা করব, পরের ছাত্র-সংসদ তাদের পূর্বসুরীদের ঐতিহ্যবহন করবে এবং কলেজের আরও সুনাম বৃদ্ধিতে সর্বদা সাহায্য করবে।

সাধরণ সম্পাদক

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুমন্ত রাত্রির সাথে একে একে তারারা ঘুমায়। অন্ধকারে উড়ে যায় রাতের পাখিরা, ডানায় আঘাত লেগে কেঁদে ওঠে ঘুমন্ত আকাশ। রাত্রির প্রহর গণি, বারংবার পিছলে গেছি দুঃস্বপ্নের পিচ্ছিল গুহায়, ভাঙাচোরা স্বপ্নের ভিতর আমি শিউরে উঠেছি বহুবার। কারণ বিগত বছর আমাদের রিক্ততার সময়। আমাদের হাহাকারের সময়। তিস্তার নীল জলে রুপালি রোদ চিক চিক করে। বিজন বাড়ীর চা বাগানে সবুজ আরো মসৃন। অথচ ৮২টা মানুষ আর ঘরে ফিরবে না। বর্ষার বাঁধভাঙা জলে ধুয়ে যাবে ত্রিপুরার শহিদের লাশের চিহ্ন। সময়ের ডাল থেকে ঝরে পড়বে জীর্ণ পাতা শুকোবে উজান ময়দানের পঞ্চলক্ষ্মীর চোখের জল। রাজস্থানের দেওরালায় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না রূপ কানোয়ারের চিতার, রুপালি ছাই—তা বলে লড়াই কি শেষ? না যতক্ষণ বুকের উপর বসে থাকবে বেনিয়মে গড়া এই রাষ্ট্র আর সমাজটা, যতক্ষন পর্যন্ত ৪১ বছরের পুরোনো স্বাধীন দেশটা, প্রতিটা মানুষকে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করে দিতে পারবে না, যতক্ষন না পর্যন্ত নানা মতের, নানা ভাষার মানুষগুলোকে সম্মান দিতে শিখবে না, যতক্ষন পর্যন্ত ৭৫ কোটি মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে থাকবে দুর্নীতিপরায়ন ভোটসর্বস্ব নীতিহীন একদল ক্লাউন— ততক্ষন পর্যন্ত আমরা নিরাপদ না। আমাদের হাতের মুঠিতে শিহরিত পায়রার মত ধরা আছে আগুনের বন্যা, আমার তোমার হাতে আজ লক্ষ লক্ষ হাত। জনমতের সবুজ অরণ্যে জাগছে রক্তের মর্মরধ্বনি। আমার ধমনীগুলো প্রথমে আতঙ্কে বোবা হয়ে থাকে তারপর আমারই রক্তে লাল হয়ে সকালের সূর্য্য ওঠে আর সেই আলোয় চেতনার তলোয়ার আবার ঝলমলিয়ে ওঠে

পলসেমুর কারাগারের ৮০/৮২নং ঘরে, আফ্রিকার জঙ্গলের থেকেও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গত ২৬ বছর ধরে বসে থাকা মানুষটির অপরাধ দেশপ্রেম, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। আমরা আমাদের কলেজে দাঁড়িয়ে ১লা সেপ্টেম্বর শপথ নিয়ে বলেছি—কৃষ্ণাঙ্গিনী তুমি কেঁদোনা, তুমি জলভরা চোখে দেখো, আমরা আসছি পৃথিবী দুলিয়ে। সমুদ্রের শব্দিত তরঙ্গে যার আলোড়ন আমরা নিয়ে আসছি অনন্ত রাত জাগার পর ভোর বেলাকার নিশ্চিত সংবাদ।

কি করা যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে, সীমিত ক্ষমতায়। তবু তারই মধ্যে চেষ্টা হয়েছে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কর্মের উন্নতি সাধনের, চেষ্টা হয়েছে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সাফল্যের মাপকাঠি দূরে রেখে শুধু এই টুকু বলা যায় আমাদের প্রচেষ্টা ছিলো আন্তরিক।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত

হাতের মুঠোয় খুব ছোট ছোট কতকগুলো স্বপ্ন নিয়ে আমরা সন্তর্পনে এগোচ্ছিলাম। চতুর্দিকে ছিলো শ্বাপদের নিঃশব্দ অথচ হিংস্র আনাগোনা। এক মুহূর্তের অবসন্নতা অথবা দুর্বলতা কেড়ে নিতে পারতো বিগত ৬ বছরের আমাদের শরীরের অনেক লোনা জলে ভেজা তিলে তিলে গড়ে তোলা সৃষ্টিকে। আমরা চিৎকার করে বলেছি চাইনা এই পোয়মানিনো টুকরো কথা আর কাগজ গড়া এ সভ্যতা। আর এই জেহাদ ঘোষনার পর আমাদের সাথে পা মেলানো মানুষের সংখ্যা হলো দ্বিগুন। আমরা বল্লাম আমরা হৃদয় ভরে হাসতে চাই, কাঁদতে চাই। কলেজের ইতিহাসে প্রথম আয়োজিত হলো- কলকাতার সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আন্তঃ কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সাফল্যের সজ্জা যার অঙ্গ জুড়ে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকায় বারবার লেখা হয়েছে আমাদের কলেজের নাম। অনেক বেড়েছে সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে বুক বেঁধে দাঁড়ানো ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। অন্ধকার পথে এই তো পথের আলো। তাই আশা আগামী দিনে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন আমরা জ্বালবই।

ক্রীড়া সম্পাদক

মানস মুখোপাধ্যায়

কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যশালী কলেজ, আশুতোষ কলেজের গত এক বছর ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি গর্বিত।

প্রথম থেকেই, বেশী সংখ্যক ছাত্রের অংশগ্রহণের দিকে নজর রেখে চেষ্টা করেছি পড়াশোনার পাশাপাশি কলেজের ছাত্ররা যেন একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারে। সাফল্যের বিচার সাধারণ ছাত্ররা করবে, একমাত্র যাদের উজ্জ্বল সহযোগিতা ছাড়া এ অগ্রগতি ছিল অসম্ভব।

বিভিন্ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টার একটা সর্বাঙ্গিন চিত্র নিচে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।